BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

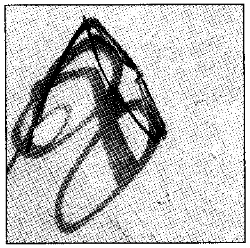

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই ঘুম ভাঙার পর ঘড়ি দেখতে চায়। কখন ঘুম ভাঙল এটা জানা যেন খুবই জরুরি। যারা কাজের মানুষ তারা যেমন ঘড়ি দেখে অকাজের মানুষরাও দেখে।

শুভ্র সম্ভবত এই দুই দলের কোনোটাতেই পড়ে না। তার ঘরে কোনো দেয়ালঘড়ি নেই। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় হাতঘড়িটাও সে বালিশের নিচে রাখে না। অথচ ঘুম ভাঙার পর তারই সবচে' বেশি সময় জানতে ইচ্ছা করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘড়ি না দেখে সময় আন্দাজ করার নানান কায়দাকানুন তার আছে। জানালা দিয়ে আসা রোদ যদি খাটের বাঁ দিকের পায়াতে ঝলমল করতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখনো আটটা বাজে নি। আটটার পর খাটের বাঁ পায়ে কোনো রোদ থাকে না।

সিলিং-এর মাঝামাঝি জায়গায় চারকোণা (ম্যাচ বাক্সের সাইজ) রোদ থাকে সকাল সাতটা পর্যন্ত। সিলিং-এ রোদ না থাকলে বুঝতে হবে সাতটার বেশি বাজে। চারকোণা এই রোদ কোন ফাঁক দিয়ে আসে শুভ্র এখনো বের করতে পারে নি। এই ব্যবস্থা অবশ্যি গরমকালের। শীতের দিনে সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘরে কোনো রোদই আসে না।

শুভ্র'র বয়স যখন দশ এগারো তখন সময় জানার তার খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল। ঠিক সাতটায় তার জানালার পাশে একটা কাক এসে বসত। ঘাড় বাঁকিয়ে রাগী রাগী চোখে শুভ্র'র দিকে তাকাত। কা কা করে দু'বার ডেকেই ঝিম মেরে যেত।

কাকটার সঙ্গে শুভ্র'র এক সময় বন্ধুত্বের মতো হয়ে যায়। সে দিব্যি ঘরে ঢুকত। নাশতা খাবার সময় সে শুভ্র'র হাত থেকে পাউরুটি খেত। শুভ্র কাকটার একটা নামও দিয়েছিল— কিংকর।

শুভ্র'র বাবা মোতাহার হোসেন বলেছিলেন, কিংকর আবার কেমন নাম ? তুই এর নাম দে Old faithful. কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় সে যখন আসে তার এই নামই হওয়া উচিত।

মোতাহার হোসেন সাহেব কাকটার সময়ানুবর্তিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিংকর সত্যি সত্যি সকাল সাতটায় আসে কি-না তা দেখার জন্যে তিনি অনেকবার সাতটা বাজার আগে ঘড়ি হাতে ছেলের ঘরে বসেছেন। এবং প্রতিবারই মুগ্ধ গলায় বলেছেন— ভেরি ইন্টারেস্টিং, কাকটা তো ঘড়ি দেখেই আসে! কোনো একজন পক্ষী বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে হবে।

শুভ্র'র মা কাকের ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করেন নি। অলুক্ষুণে পাখি রোজ ছেলের ঘরে এসে ঢুকবে কেন? কোনো কাক কখনোই মানুষের কাছে আসে না। এটা কাক না, অন্য কিছু।

মোতাহার হোসেন বললেন, অন্য কিছু মানে কী?

কাকের বেশ ধরে অন্য কিছু আসছে। খারাপ জিনিস। কাকটা আসা শুরু করার পর থেকে শুভ্র কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে লক্ষ করছ না?

মোতাহার হোসেন বললেন, আমি তো কিছু লক্ষ করছি না।

কী আশ্চর্য! শুভ্র'র চোখের নিচে কালি পড়েছে, তুমি দেখছ না? এই বদকাক যেন না আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষপর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। কাকটা প্রায় এক বৎসর রোজ এসে হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল।

এখন শুভ্র'র বয়স চব্বিশ। প্রায় বার-তের বছর আগের ব্যাপার, অথচ শুভ্র'র মনে হয়— তার বয়স বাড়ে নি। সময় আটকে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিংকর এসে জানালায় বসে গম্ভীর গলায় দু'বার কা কা করেই চুপ করে যাবে। এই কাকটা মাত্র দু'বার ডাকে, তারপর আর ডাকে না।

শুভ্র'র ঘুম ভেঙেছে অনেক আগেই। সে বিছানায় শুয়ে আছে। সময় কত হয়েছে সে ধরতে পারছে না। আষাঢ় মাস। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। খাটের নকশা করা পায়াতে আলো এসে পড়ে নি। সময়টা জানার জন্যে সে নিজের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করছে। যেন তাকে আজ কোনো কাজে যেতে হবে। খুবই জরুরি কোনো কাজ। অথচ তার কোনো কাজ নেই। শুভ্র দিনের প্রথম চায়ের জন্যে অপেক্ষা শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকিনা নামের এই বাড়ির কাজের মেয়েটা চা নিয়ে আসবে। শুভ্র'র ঘুম ভাঙলেই এই মেয়ে কীভাবে যেন টের পায়। চায়ের কাপ হাতে জানালার বাইরে এসে ক্ষীণ গলায় বলে— ভাইজান, চা এনেছি। শুভ্র যে জেগেছে মেয়েটা টের পায় কী করে? কোনো একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে। সেই কোনো একদিন যে আজই হতে হবে তা-না।

ভাইজান, চা এনেছি।

শুভ্র কিছু বলল না। বিছানায় উঠে বসল। সকিনা ঘরে ঢুকল। শুভ্রকে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলতে হলো না। তার ঘরের দরজা সবসময় খোলা থাকে।

চায়ের কাপ হাতে দিয়েই সকিনা চলে যায় না, কাপে চুমুক না দেয়া পর্যন্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুভ্র'র ধারণা চায়ের কাপে চুমুক দিতে সে যদি পনের মিনিট দেরি করে তাহলে এই মেয়েটা পনের মিনিট মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কোনো একদিন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে দশ পনেরো মিনিট বসে থাকবে। দেখার জন্যে মেয়েটা সত্যি দাঁড়িয়ে থাকে কি-না। আজই যে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। Some other day.

শুভ্র চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিছানা থেকে নামল। এখন তার কাজ কম্পিউটার চালু করে কয়েক লাইন লেখা। এই অভ্যাস আগে ছিল না, নতুন হয়েছে। মানুষ যে-কোনো অভ্যাসে দ্রুত অভ্যস্থ হয়ে যায়।

শুভ্র কী-বোর্ডে অতি দ্রুত হাত চালাচ্ছে। স্ক্রিনে লেখা উঠছে, এই সঙ্গে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে। সাউন্ডবক্স থেকে পিয়ানো বাজানোর মতো শব্দ হচ্ছে। এটা শুভ্র'র নতুন কর্মকাণ্ড। সে একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে। প্রতিটি অক্ষরের জন্যে পিয়ানোর একটা রিডের শব্দ। ব্যাপারটা এরকম যেন শব্দ শুনে সে বলে দিতে পারে কী লেখা হচ্ছে।

সে লিখছে—

> আজ আকাশ মেঘলা। কয়েক দিন থেকেই আকাশ মেঘলা যাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। আজ হবে কি-না কে জানে। রাতে আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে আমি একটা ক্লাসরুমে বক্তৃতা দিচ্ছি। আমার হাতে চক। পেছনে বিশাল ব্লাকবোর্ড। ব্লাকবোর্ডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত জটিল একটা সমীকরণ লেখা। কী সমীকরণ তা এখন মনে পড়ছে না। তবে আমার ধারণা টাইম ডিপেনডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকোয়েশন। স্বপ্নটা মজার এই জন্যে যে ক্লাসে কোনো ছাত্র নেই। প্রতিটি চেয়ার খালি। অথচ আমি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। স্বপ্নটা আরেকটা কারণে মজার, সেটা হচ্ছে স্বপ্ন ছিল রঙিন।
>
> বইপত্রে পড়েছি স্বপ্ন সাদাকালো। অথচ আমার বেশিরভাগ স্বপ্নই রঙিন। কাল রাতের স্বপ্ন যে রঙিন ছিল এতে আমার মনে কোনোরকম সন্দেহ নেই। আমার স্পষ্ট মনে আছে ক্লাসরুমের চেয়ারগুলি ছিল হলুদ রঙের। আমার গায়ে

একটা সুয়েটার ছিল। সুয়েটারের রঙ লাল। আমার স্বপ্নগুলি রঙিন কেন এই বিষয়ে একজন স্বপ্নবিশারদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। স্বপ্ন বিষয়ে আমার খুব কৌতূহল আছে।

জন্মান্ধরা স্বপ্ন দেখে কি দেখে না এই নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। তারপর নিজেই ভেবে ভেবে বের করলাম তাদের স্বপ্ন দেখার কোনো কারণ নেই। দৃশ্যমান জগতের কোনো স্মৃতি তাদের নেই। স্বপ্ন তারা কীভাবে দেখবে? অনেক পরে বইপত্র পড়ে জেনেছি আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক। জন্মান্ধরাও স্বপ্ন দেখে, তবে সেই স্বপ্ন শব্দের স্বপ্ন। তাদের স্বপ্নে কখনো ছবি থাকে না, থাকে শব্দ।

এই পর্যন্ত লিখে শুভ্র থামল। যুক্তাক্ষরে পিয়ানোর যে শব্দ আসছে তা কানে লাগছে। সফটওয়্যারে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। যুক্তাক্ষর যাই হোক একটা মাত্র নোট বাজবে। এই নোটটির যুক্তাক্ষর ছাড়া অন্য ব্যবহার থাকবে না।

শুভ্র আবার লিখতে শুরু করল—

স্বপ্ন ব্যাপারটা আমি খুব ভালোমতো জানতে চাই। কারণ আমি অতি দ্রুত অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। তখন আমার জগৎ হবে শুধুই শব্দময়। দৃশ্যমান জগৎ তখন দেখা দেবে স্বপ্নে। আমি যেহেতু জন্মান্ধ না, আমি অবশ্যই স্বপ্ন দেখব। আমার এখন উচিত চমৎকার সব দৃশ্য দেখে দেখে সেইসব স্মৃতি মাথায় ঢুকিয়ে রাখা।

আমার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনো ডাক্তারই সেটা বন্ধ করতে পারছেন না।

আমার বাবা অতি ক্ষমতাধর মানুষদের একজন। তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। চেষ্টায় কাজ হচ্ছে না। আমার শেষ চিকিৎসা করলেন একজন জার্মান ডাক্তার। তাঁর নাম বার্নড ব্রোসার্ড। তিনি জার্মান ভাষায় যা বললেন তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে— যুবক, আমি দুঃখিত। আমরা অগ্রসরমান বিপদ রোধ করতে পারছি না। ঘটনা ঘটবেই।

আমি বললাম, কখন ঘটবে?

ভদ্রলোক বললেন, সেটা বলতে পারছি না। সেটা কালও হতে পারে; আবার এক বছর, পাঁচ বছর, দশ বছরও লাগতে পারে।

আমি বললাম, বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!

ডাক্তার সাহেব বললেন, ইন্টারেস্টিং কোন অর্থে?

আমি বললাম, প্রতিদিন ঘুম ভাঙার সময় আমি প্রবল এক উত্তেজনা অনুভব করব। চোখ মেলার পর কী হবে? আমি কি দেখতে পাব? না-কি দেখতে পাব না? আমার জন্যে প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থে ইন্টারেস্টিং।

শুভ্র কম্পিউটার ছেড়ে চেয়ারে এসে বসল। ঘরের আলো আরো কমে এসেছে। মনে হয় আকাশ ভর্তি হয়ে গেছে কালো মেঘে। আষাঢ় মাসের এই আকাশটা দেখে রাখা উচিত। স্বপ্ন দেখার সময় কাজে লাগবে। সমস্যা হচ্ছে ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছা করছে না। অন্য আরেকদিন দেখা যাবে। Some other day.

জাহানারা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। শুভ্র এরকম করছে কেন? কেমন কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে বই। বই পড়তে পড়তে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে। মাদ্রাসার তালেবুল এলেমরা কোরান শরীফ পড়ার সময় এইভাবে মাথা দোলায়। শুভ্র নিশ্চয় কোরান শরীফ পড়ছে না।

জাহানারার ইচ্ছা করছে ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন— এই তুই এরকম করছিস কেন? তিনি অনেক কষ্টে ইচ্ছাটা চাপা দিলেন। গতকাল রাতে শোবার সময় জাহানারা ঠিক করেছেন আগামী বাহাত্তর ঘণ্টা তিনি ছেলের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। মাতা-পুত্রের অভিমান জাতীয় কোনো ব্যাপার না। জাহানারা ছোট্ট একটা পরীক্ষা করছেন। তিনি দেখতে চান তার কথা বলা বন্ধ করে দেয়াটা শুভ্র ধরতে পারছে কি-না। ধরতে অবশ্যই পারবে, কিন্তু কত ঘণ্টা পরে পারবে সেটাই জাহানারার পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে মাত্র সাড়ে এগারো ঘণ্টা পার হয়েছে। এখনো শুভ্র কিছু বুঝতে পারছে না।

জাহানারা আরো কিছুক্ষণ শুভ্র'র ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুভ্র তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সে বসেছে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। বসার ভঙ্গি কুৎসিত। প্রাইমারি স্কুলের বুড়ো হেডমাস্টার সাহেবদের মতো চেয়ারে পা তুলে বসেছে। তার গায়ের পাঞ্জাবিটা কুঁচকানো। তার মানে রাতে যে পাঞ্জাবি পরা ছিল এখনো সেই বাসি পাঞ্জাবি গায়ে আছে। কোনো মানো হয়? আজও সে শেভ করতে ভুলে গেছে। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। জাহানারা চিন্তিত ভঙ্গিতে দক্ষিণের বারান্দার দিকে রওনা হলেন।

দক্ষিণের চিক দিয়ে ঢাকা বড় বারান্দাটা শুভ্র'র বাবা মোতাহার হোসেনের পত্রিকা পড়ার জায়গা। এখানে বড় একটা বেতের ইজিচেয়ার আছে। প্রতিদিন ভোরবেলায় ইজিচেয়ারের বাঁ-দিকের হাতলে চারটা খবরের কাগজ রাখা হয়। ডান-দিকের হাতলের পাশের ছোট্ট টেবিলে থাকে মাঝারি আকৃতির একটা টি-পট ভর্তি চা, এক প্যাকেট সিগারেট এবং লাইটার। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি পর পর কয়েক কাপ চা খান। চায়ের সঙ্গে সিগারেট। সারাদিনে তিনি চা সিগারেট কোনোটাই খান না। শুধু রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে ইজিচেয়ারে এসে বসেন। দিনের শেষ সিগারেট এবং শেষ চা খেয়ে ঘুমুতে যান। শুভ্র এই জায়গাটার নাম দিয়েছে— 'ধোঁয়াঘর'।

মোতাহার হোসেন বেঁটেখাটো শুকনা ধরনের মানুষ। তার চেহারাটা রাগী রাগী হলেও কারো উপর কখনো রাগ করেছেন বলে শোনা যায় না। ব্যাংকে এই ভদ্রলোকের নগদ অর্থ আছে পাঁচশ এগারো কোটি টাকা। আমেরিকার চেস ম্যানহাটন ব্যাংকেও তার প্রচুর অর্থ জমা আছে। সঠিক হিসাব তার নিজের কাছেও নেই। অতি বিত্তবানদের নানান বদনেশা এবং বদখেয়াল থাকে। এই ভদ্রলোকের সেইসব কিছু নেই। তিনি তার সমস্ত শক্তি, মেধা এবং কল্পনা অর্থ উপার্জনেই ব্যয় করছেন। ইলেকশানের সময় তিনি বিএনপি, আওয়ামী লীগ দু'দলকেই এক কোটি টাকা চাঁদা দেন। দুই দলই তাকে নমিনেশন নেওয়ার জন্যে ঝুলাঝুলি করে। তিনি দু'দলকেই বলেন— 'আরে ভাই, আমি শুটকি মাছের ব্যবসায়ী। আমি ইলেকশন কী করব!' মোতাহার হোসেনের অনেক ধরনের ব্যবসা থাকলেও শুটকি মাছের কোনো ব্যবসা নেই। তারপরেও এই কথা কেন বলেন তিনিই জানেন।

জাহানারা যখন স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তখন মোতাহার হোসেনের হাতে তৃতীয় চায়ের কাপ। তিন নম্বর সিগারেট সবে ধরিয়েছেন। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, Hello young lady!

জাহানারা বললেন, রাখ তোমার young lady! শুভ্র কী করছে জানো?

মোতাহার হোসেন বললেন, ভয়ঙ্কর কিছু কি করেছে?

মাথা দোলাতে দোলাতে বই পড়ছে।

খুব বেশি কি দোলাচ্ছে?

জাহানারা বললেন, তুমি ঠাট্টার গলায় কথা বলছ কেন? তোমার ঠাট্টার এই ভঙ্গি আমার একেবারেই পছন্দ না।

মোতাহার হোসেন বললেন, অতি তুচ্ছ বিষয়ে তুমি যে টেনশান কর সেটা দেখলে ঠাট্টা ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় আসে না।

একটা জোয়ান ছেলে পেন্ডুলামের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে বই পড়ছে, এটা তুচ্ছ বিষয়?

অবশ্যই তুচ্ছ বিষয়। সে যদি পা উপরে দিয়ে মাথা নিচে রেখে শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে বই পড়ত তাহলে সামান্য টেনশান করা যেত।

সামান্য?

হ্যাঁ সামান্য। শুভ্র'র বয়সী ছেলেদের হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভট কিছু করতে ইচ্ছা করে। সেটাই স্বাভাবিক।

তুমি তো শুভ্র'র বয়সী এক সময় ছিলে। তুমি উদ্ভট কিছু করেছ?

মোতাহার হোসেন আগ্রহ নিয়ে বললেন, অবশ্যই করেছি। শুনতে চাও? সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে আমরা তিন বন্ধু বটগাছে বসে ছিলাম। বটগাছটা ছিল ডিসট্রিক্ট বোর্ড সড়কের পাশে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল...।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, প্লিজ, আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না। তুমি ছেলের ঘরে যাও, ঘটনা কী জেনে আস।

টেনশানটা যেহেতু তোমার, তুমি যাও।

আমি যাব না। তুমি যাবে। সব কিছু জেনে আসবে। কী বই পড়ছে, মাথা দোলাতে দোলাতে কেন পড়ছে। তার ঘটনা কী?

এই দুটা পয়েন্ট জানলেই হবে?

আরেকটা পয়েন্ট আছে। শুভ্র দাড়ি শেভ করে নি। আমি পুরোপুরি দেখতে পারি নি, কিন্তু মনে হচ্ছে করে নি। কারণটা কী? জিজ্ঞেস করে জানবে।

আমি কারণ বলে দিচ্ছি। শুভ্র'র বয়েসী ছেলেরা চেহারা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসে। হুট করে দাড়ি রেখে ফেলা, গোঁফ রেখে ফেলা, মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হওয়া কমন ব্যাপার।

শুভ্র কমন ছেলে না। অন্য দশজন ছেলে যা করবে তা সে করবে না। আমি নিশ্চিত ও কিছু মানসিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?

তার মধ্যে কোনো টেনশান দেখছ? কোনো টেনশান নেই। এই যে আমি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি সে বুঝতেও পারছে না।

মোতাহার হোসেন অবাক হয়ে বললেন, তুমি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছ?

জাহানারা বললেন, হ্যাঁ।

কারণটা কী?

আমি দেখতে চাচ্ছি শুভ্র ব্যাপারটা বুঝতে পারে কি-না। আমার অভাব অনুভব করে কি-না। তোমার সঙ্গে এত বকবক করতে পারব না। তোমাকে যা করতে বলছি দয়া করে করো।

ঠিক আছে। আরেক কাপ চা খেয়ে নেই। চা-টা ভালো হয়েছে।

পরে এসে চা খাও। চা পালিয়ে যাচ্ছে না।

তোমার ছেলেও পালিয়ে যাচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে সে মাথা দোলাতেই থাকবে।

প্লিজ, শুভ্রকে নিয়ে রসিকতা করবে না।

মোতাহার হোসেন কাপে চা ঢাললেন। সিগারেট ধরালেন। জাহানারার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জাহানারা অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন বলে এই হাসি দেখতে পেলেন না। জাহানারা বললেন, তুমি আবার সিগারেট ধরিয়েছ ?

সিগারেট-চা হাতে নিয়েই যাচ্ছি।

অবশ্যই না। তুমি আমার ছেলের ঘরে সিগারেট নিয়ে ঢুকবে না। Passive smoking অনেক বেশি ক্ষতি করে। সিগারেট শেষ করে যাও।

মোতাহার হোসেন সিগারেটে একটা টান দিয়ে চায়ের কাপে ফেলে দিলেন। কাপের পাশেই অ্যাসট্রে আছে। অ্যাসট্রে'তে ফেললেন না। কাজটা করলেন স্ত্রীকে বিরক্ত করার জন্যে। স্ত্রীকে বিরক্ত করতে তার ভালো লাগে। কিন্তু আজ জাহানারা ব্যাপারটা লক্ষ্য করল না। তার মাথায় অন্য কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে।

শুভ্র'র ঘরে ঢুকে মোতাহার হোসেন বললেন, Hello young man!

শুভ্র বাবার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, Hello old man and the sea!

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর কাছে তিনটা বিষয় জানতে এসেছি। ঝটপট জবাব দে। নাম্বার ওয়ান— কী বই পড়ছিস ?

ম্যাজিকের একটা বই পড়ছি— Amazing Magic Book। অনেক ম্যাজিক শিখে ফেলেছি।

খুবই ভালো। একদিন ম্যাজিক দেখব। পয়েন্ট নাম্বার টু— ম্যাজিকের বই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছিস কেন ?

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছি না-কি ?

Yes my son. তোর মা'র কাছে শুনলাম, তুই মোটামুটি পেন্ডুলাম হয়ে গেছিস।

ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। বইটা পড়ার সময় মাথার ভেতর একটা গান বাজছিল। মনে হয় গানের তালে তালে মাথা নাড়ছিলাম।

কী গান ?

কিং স্টোন ট্রায়োর গান— Where have all the flowers gone.

পয়েন্ট নাম্বার থ্রি— দাড়ি শেভ করছিস না কেন ?

শুভ্র হাসল। মোতাহার হোসেন বললেন, দাড়ি রাখবি ঠিক করেছিস ? আমার ধারণা দাড়িতে তোকে ইন্টারেস্টিং লাগবে। আরেকটু বড় না হলে অবশ্য বোঝা যাবে না। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমি কিছুদিন দাড়ি রেখেছিলাম। তখন আমার নাম হয়ে গেল 'ছাগল মোতাহার'। শুধু থুতনিতে কিছু, এই জন্যেই ছাগল মোতাহার নাম।

শুভ্র বলল, তুমি দাড়িয়ে আছ কেন ? বসো।

মোতাহার হোসেন বসতে বসতে বললেন, দেখি কী ম্যাজিক শিখেছিস। একটা ম্যাজিক দেখা।

আমি শুধু কৌশলগুলো শিখছি, দেখাতে পারব না। জিনিসপত্র নেই।

জিনিসপত্র ছাড়া ম্যাজিক হয় না ?

শুভ্র বলল, একটা ম্যাজিক অবশ্য জিনিসপত্র ছাড়াই পারব। তোমাকে একটু বাইরে যেতে হবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, বাইরে যেতে পারব না। আমি বরং চোখ বন্ধ করে থাকি, তুই গুছিয়ে নে।

তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ছেলের সামনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে তার ভালো লাগছে। শুভ্র তেমন কোনো ম্যাজিক দেখাতে পারবে বলে তার মনে হচ্ছে না। তারপরও তিনি ঠিক করলেন শুভ্র যাই দেখাক তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হবার ভান করবেন। যদিও বিস্মিত হবার ভান করাটা বেশ কঠিন হবে বলেই তার ধারণা। সবচে' সহজ হলো রেগে যাবার ভান করা। ভুরু কুঁচকে এক দৃষ্টিতে শুধু তাকানো।

বাবা, চোখ খোল।

মোতাহার হোসেন চোখ মেললেন। শুভ্র বলল, দেখ এই কাগজটায় দশটা ফুলের নাম লিখেছি। এখান থেকে যে-কোনো একটা ফুলের নাম বলো।

মোতাহার হোসেন বললেন, টগর।

শুভ্র বলল, তুমি যে টগর ফুলের নাম বলবে এটা আমি জানতাম। বলতে পার এক ধরনের মাইন্ড রিডিং। টেলিপ্যাথি। তোমার সামনে যে মগটা আছে সেটা তুলে দেখ, মগের নিচে একটা কাগজে আমি টগর লিখে রেখেছি।

মোতাহার হোসেন মগ তুলে দেখলেন সত্যি সত্যি লেখা টগর। তিনি ছেলের দিকে তাকালেন। শুভ্র মিটি মিটি হাসছে। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, ভেরি স্ট্রেঞ্জ! কীভাবে করলি?

শুভ্র বলল, সেটা তোমাকে আমি বলব না।

বলবি না কেন?

শুভ্র বলল, এই ম্যাজিকের কৌশলটা এতই সহজ যে বললেই তোমার বিস্ময় পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যে একটু আগে বিস্মিত হচ্ছিলে সেটা ভেবেই বিরক্ত হবে। তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি তুমি খুবই অবাক হয়েছ। এই অবাক ব্যাপারটা আমি নষ্ট করতে চাই না।

তোর ফুলের ম্যাজিকটা কি ইচ্ছা করলে আমি শিখতে পারব?

অবশ্যই পারবে। তবে আমি শেখাব না।

শুভ্র বাবার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার চোখ ঝিলমিল করছে।

মোতাহার হোসেনের ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। 'প্লিজ বাবা, আমাকে শিখিয়ে দে' জাতীয় কথা বলতে মন চাইছে। ছেলের সঙ্গে কিছু ছেলেমানুষী নিশ্চয়ই করা যায়।

শুভ্র বলল, আজ তুমি অফিসে যাবে না?

মোতাহার হোসেন বললেন, এখনো বুঝতে পারছি না। মনে হয় যাব না।

সারাদিন কী করবে?

তাও ঠিক করি নি। কোনো কাজ না করাটা সবচে' কঠিন কাজ। মনে হচ্ছে কঠিন কাজটাই করতে হবে।

মোতাহার হোসেন উঠে দাঁড়ালেন। তার হাতে শুভ্র'র লেখা 'টগর' কাগজটার চিরকুট। এই চিরকুট তিনি কেন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেও জানেন না। তিনি অফিসে যাবেন না— এই কথাটা শুভ্রকে কেন বললেন তাও বুঝতে পারছেন না। তার শরীর মোটামুটি সুস্থ আছে অথচ তিনি অফিসে যান নি এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি।

শুভ্র বলল, টগর নামটা যে রবীন্দ্রনাথের খুব অপছন্দের নাম এটা কি তুমি জানো?

মোতাহার হোসেন বললেন, না।

একদিন কী হয়েছে শোন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে আছেন। তাঁর সামনে দিয়ে কিছু সাঁওতাল মেয়ে যাচ্ছে, তাদের খোঁপায় টগর ফুল গোঁজা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বাহ কী সুন্দর ফুল! ফুলটার নাম কী?

তারা বলল, টগর। তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, এত সুন্দর ফুলের এমন বাজে নাম? আমি ফুলটার নাম পাল্টে দিলাম। এখন থেকে ফুলের নাম মহাশ্বেতা। ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং না? একজন মানুষের কত ক্ষমতা। ইচ্ছা হলো তো ফুলের নাম পাল্টে দিল। টগর হয়ে গেল মহাশ্বেতা।

মোতাহার হোসেন বললেন, ঘটনাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।

বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

রবীন্দ্রনাথ টগর ফুল চিনবেন না এটা হতে পারে না। তাছাড়া টগর নামটা মহাশ্বেতার চেয়েও সুন্দর।

শুভ্র বলল, বাবা, আমি কিন্তু এই ঘটনা বইয়ে পড়েছি। এমন একজন মানুষের লেখা বই যিনি রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ।

ছাপার অক্ষরে লেখা সব কথাই যে সত্যি তোকে কে বলল? যে মানুষ মুখে মিথ্যা বলে, সে হাতেও মিথ্যা লিখতে পারে। পারে না? মুখে মিথ্যা বলার চেয়ে বইয়ে মিথ্যা লেখা বরং সহজ।

শুভ্র কিছু বলল না। মোতাহার হোসেনের মনে হলো শুভ্র সামান্য মন খারাপ করেছে। মন খারাপ করার মতো কোনো কথা তিনি বলেন নি। তার যদি মন খারাপ হয়েও থাকে সে তা প্রকাশ করবে কেন? মানুষের মধ্যে শম্বুক প্রকৃতি আছে। শামুক যেমন কোনো ঝামেলা দেখলে খোলসের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়, মানুষও সে-রকম নিজের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করতে পারে। শুধু শুভ্র পারে না। তার কোনো খোলস নেই। এই সমস্যা সে নিশ্চয়ই জন্মসূত্রে নিয়ে আসে নি। তারা ছেলেকে ঠিকমতো বড় করতে পারেন নি।

মোতাহার হোসেন তার চা খাবার জায়গায় এসে বসলেন। তার হাতে 'টগর' লেখা চিরকুট। চট করে তার মাথায় ম্যাজিকের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। শুভ্র দশটা ফুলের নাম লিখে এই ধরনের চিরকুট দশটা জায়গায় সাজিয়ে রেখেছে। তিনি যদি টগর না বলে গোলাপ বলতেন তাহলে হয়তো গোলাপ লেখা চিরকুটটা কোনো একটা বইয়ের নিচ থেকে বের হতো। মূল ব্যাপার হলো কোন ফুলের চিরকুট কোথায় লুকানো সেটা মনে রাখা।

এই তুমি এতক্ষণ কী করলে?

জাহানারা খুবই বিরক্ত হয়ে মোতাহার হোসেনের দিকে এগুলেন। ঝাঁঝালো গলায় বললেন, তিনটা প্রশ্ন করতে গিয়ে দিন পার করে দিলে? শুভ্র কী বলেছে? সে মাথা দুলিয়ে বই পড়ছিল কেন?

মোতাহার হোসেন বললেন, তার মাথার ভেতর গান বাজছিল। গানের তালে তালে সে মাথা নাড়ছিল।

জাহানারা আতঙ্কিত গলায় বললেন, মাথার ভেতর গান বাজছিল মানে কী ? এটা আবার কোন ধরনের অসুখ ?

মোতাহার হোসেন বললেন, এটা কোনো অসুখ না। সবার মাথার ভেতরই গান বাজে। তোমারও বাজে।

না, আমার মাথার ভেতর কোনো গান ফান বাজে না। আর বাজলেও আমি এইভাবে মাথা ঝাকাই না। শুভ্র কী বই পড়ছিল ?

ম্যাজিকের বই।

এই বয়সে সে ম্যাজিকের বই পড়বে কেন ? এইসব বই সিক্স সেভেনে পড়বে। এতক্ষণ তোমরা কী করলে ?

শুভ্র আমাকে একটা ম্যাজিক দেখাল। এই জন্যেই দেরি হলো। ফুলের একটা ম্যাজিক।

কী ম্যাজিক ?

সে দশটা ফুলের একটা লিস্ট করে আমাকে বলল, যে-কোনো একটা ফুলের কথা মনে মনে ভাবতে। আমি টগর ফুলের কথা ভাবলাম। সে তার ট্যালিপ্যাথিক ক্ষমতা দিয়ে বলে দিল। ইন্টারেস্টিং ম্যাজিক।

জাহানারার খুবই খারাপ লাগছে। ছেলে তার বাবাকে ম্যাজিক পর্যন্ত দেখিয়ে ফেলেছে। অথচ তার সঙ্গে যে কথা বন্ধ এটা পর্যন্ত তার মনে নেই। যেন এই বাড়িতে জাহানারা নামের কোনো মহিলা বাস করেন না।

শেভ করা বন্ধ করেছে কেন— এটা জিজ্ঞেস করেছ ?

জিজ্ঞেস করেছি, উত্তর দেয় নি। তবে আমি যা ধারণা করেছি তাই।

তোমার ধারণার কথা তো আমি শুনতে চাচ্ছি না। ওর ধারণাটা জানতে চাচ্ছি। তুমি আবার শুভ্র'র কাছে যাও। ভালোমতো জেনে আস।

মোতাহার হোসেন বললেন, তুমি তোমার ঘরে যাও। দু'টা দশ মিলিগ্রামের রিলাক্সিন ট্যাবলেট খেয়ে, দরজা-জানালা বন্ধ করে এসি ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক। আমি নিশ্চিত তোমার প্রেসার বেড়েছে। নাক ঘামছে। গাল লাল। তোমার কথাবার্তাও জড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি শুভ্র'র কাছে যাবে না ?

না। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমি মাতামাতি করি না।

তুমি কী নিয়ে মাতামাতি কর ?

মোতাহার হোসেন স্ত্রীর দিকে তাকালেন। চোখ নামালেন না। তার এই দৃষ্টির সঙ্গে জাহানারা পরিচিত। তিনি শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। এই সময় শুভ্র তার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তার মুখ হাসি হাসি। ভারী চশমার ভেতর দিয়েও তার সুন্দর চোখ দেখা যাচ্ছে। শুভ্র এগিয়ে আসছে তার দিকেই। জাহানারা থমকে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে ছেলের মনে পড়েছে মা'র সঙ্গে কথা হচ্ছে না। তাও ভালো। জাহানারা ঠিক করে ফেললেন, ছেলের সঙ্গে প্রথম বাক্যটা কী বলবেন। কঠিন গলায় বলবেন, শুভ্র বাবা, বাথরুমে যাও। ক্লিন শেভড হয়ে বের হয়ে আস। সন্ন্যাসী সাজ আমার পছন্দ না।

কী আশ্চর্য, শুভ্র তাকে কিছু না বলে তার বাবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোতাহার হোসেন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, Hello young man!

শুভ্র বলল, Hello old man and the sea!

তুই আমার সামনে বসে দশটা ফলের নাম বল। তোকে আমি মজার একটা ট্যালিপ্যাথিক খেলা দেখাব।

জাহানারা নিজের ঘরে ঢুকলেন। দু'টা রিলাক্সিনের জায়গায় চারটা রিলাক্সিন খেলেন। সকিনাকে ডেকে বললেন, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিতে। সকিনা তার কাজের মেয়ে। সকিনার একমাত্র ডিউটি হচ্ছে তার সেবাযত্ন করা। সকিনার বয়স অল্প। চেহারা সুন্দর। তার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় বলেই বোধহয় ভাষা সুন্দর। অন্য বুয়াদের মতো 'আইছি খাইছি' বলে না, 'এসেছি খেয়েছি' বলে।

সকিনা বলল, মা, আপনের শরীর খারাপ ?

তিনি বললেন, শরীর ঠিক আছে।

সকিনা বলল, মাথায় তেল দিয়ে দেব ?

দাও। তার আগে এসি ছাড়। ম্যাক্সিমাম কুলে দাও। হাতের কাছে একটা চাদর রাখ। ঘর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমার গায়ে চাদর দেবে। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে কেউ যেন আমার ঘুম না ভাঙায়। শুধু শুভ্র এসে ডাকলে ঘুম ভাঙাবে।

ঠিক আছে মা।

আমি দুপুরে খাব না। খাবারের সময় ডাকবে না। শুভ্র যদি খেতে বসে আমাকে ডাকে তাহলে ঘুম থেকে তুলবে।

ঠিক আছে মা।

সকিনা চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। জাহানারা আরাম পাচ্ছেন। এই মেয়েটা চুলে বিলি করার ব্যাপারটা জানে। সে গুছিয়ে কথা বলতেও জানে। আম্মা না বলে সে বলে 'মা'। 'মা' শুনতে ভালো লাগে।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র'র মতো সুন্দর ছেলে কি তুমি তোমার জীবনে দেখেছ ?

জি-না।

আমাকে খুশি করার জন্যে কোনো কথা বলবে না। খুশি করানো কথা আমার পছন্দ না। সত্যিটা বলো।

ভাইজানের মতো সুন্দর ছেলে আমি দেখি নি মা।

জাহানারা ঘুম ঘুম চোখে বললেন, স্কুলে ছেলেরা শুভ্রকে ডাকত 'লালটু'। স্কুলের ছেলেরা পাজি হয় তো, এই জন্যে পাজি পাজি নাম দেয়। কলেজে তাকে সবাই ডাকত প্রিন্স। ইউনিভার্সিটিতে তার কী নাম হয়েছে জানো ?

জানি মা। আপনি একবার বলেছেন— রাজকুমার।

কী সুন্দর নাম তাই না ? মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে তাকে শুভ্র না ডেকে রাজকুমার ডাকি।

ডাকলেই পারেন।

রাজকুমার অনেক বড় নাম। ডাকনাম হতে হয় তিন অক্ষরের মধ্যে।

এইসব নিয়মকানুন তো মা আমি জানি না।

জাহানারা পাশ ফিরলেন। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুম এখনো আসে নি, এর মধ্যেই তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। স্বপ্নে শুভ্র এসে ঢুকেছে তার ঘরে। তার মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। মাথার চুলও বাউলদের মতো লম্বা। চুল দাড়ির রঙ কালো না, খয়েরি। শুভ্র বলল, মা, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো। তিনি বললেন, তোকে হনুমানের মতো দেখাচ্ছে। শুভ্র বলল, হনুমানের কি দাড়ি আছে ? তিনি বললেন, আছে কি-না তা জানি না। তোকে যে হনুমানের মতো দেখাচ্ছে এটা জানি। শুভ্র বলল, মা, আমি যদি তোমার পাশে শুয়ে থাকি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে ? তিনি বললেন, অবশ্যই সমস্যা আছে। মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে আমি কোনো হনুমানকে আমার পাশে শুতে দেব না। তুই দাড়ি গোঁফ কামিয়ে আয়, তারপর বিবেচনা করব। শুভ্র নিষেধ সত্ত্বেও মা'র পাশে শুয়ে পড়ল। তিনি বললেন, বাবা, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে তো।

শুভ্র মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার আঙুলগুলি বরফের মতো ঠাণ্ডা। কী যে আরাম লাগছে। জাহানারা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

জাহানারার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন তার বিছানার পাশে শুভ্র বসে আছে। তার চোখ ঘুমঘুম। যেন সে এতক্ষণ সত্যি সত্যি তার পাশেই শুয়েছিল। শুভ্র বলল, মা, তোমার কি শরীরটা খারাপ ?

তিনি বললেন, না।

দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছ, মাইগ্রেনের ব্যথা না তো ?

জাহানারা পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, মাইগ্রেনের ব্যথা হলে তুই কী করবি ?

শুভ্র বলল, মন্ত্র পড়ে ব্যথা কমাব। উইচক্রাফটের বই থেকে মন্ত্র শিখেছি। পড়ব মন্ত্রটা ?

জাহানারা মুগ্ধ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। দিনের শেষবেলায় সব মানুষকেই সুন্দর লাগে, সেখানে শুভ্রকে দেবদূতের মতো লাগবে সেটাই তো স্বাভাবিক। শুধু সে যদি কালো রঙের একটা হাফ শার্ট পরত! কালো রঙে শুভ্র'র গায়ের আসল রঙ ফুটে বের হতো।

শুভ্র বলল, চুপ করে আছ কেন মা ? মন্ত্র পড়ব ?

জাহানারা ছেলের কোলে হাত রাখতে রাখতে আদুরে গলায় বললেন, পড় দেখি তোর মন্ত্র।

শুভ্র বলল, এই মন্ত্রের জন্যে আগরবাতি জ্বালাতে হবে।

জাহানারা বললেন, আগরবাতি এখন কোথায় পাবি ?

শুভ্র হাসিমুখে বলল, আগরবাতি আমি সঙ্গে করে এনেছি।

জাহানারা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তার মন বলছে এই ছেলেকে তিনি বুঝতে পারেন না। এতক্ষণ ভাবছিলেন শুভ্র মা'কে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে মন খারাপ করেছে। মন্ত্র পড়ে মা'র মাথার ব্যথা সারাতে চাচ্ছে। এখন তার কাছে মনে হচ্ছে শুভ্র'র কাছে পুরো ব্যাপারটাই খেলা। সে এক ধরনের মজা করবে বলে কাউকে দিয়ে আগরবাতি আনিয়েছে। আগরবাতি জ্বালাবার জন্যে পকেটে করে নিশ্চয়ই দিয়াশলাইও এনেছে।

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। দু'টা আগরবাতির স্টিক জ্বালাল। মায়ের কপালে হাত রেখে ভারী গম্ভীর গলায় বলল,

Change this incense strong and fast
To send out the magic I shall cast.
Burn so quickly and burn so bright,
This magic incense I will light.

জাহানারার কেমন যেন লাগছে। সারা শরীরে শান্তি শান্তি ভাব। শুভ্র মন্ত্রটা সুন্দর করে পড়েছে তো।

শুভ্র বলল, মা, মাথাব্যথা চলে গেছে না?

জাহানারা বললেন, চলে গেছে।

শুভ্র বলল, এরপর যদি কখনো মাথাব্যথা হয় দরজা-জানালা বন্ধ করবে না। আমাকে ডাকবে, মন্ত্র পড়ে মাথাব্যথা সারিয়ে দেব।

জাহানারা বললেন, আচ্ছা খবর দেব।

শুভ্র উঠে যাবার ভঙ্গি করতেই জাহানারা ছেলের হাত ধরে ফেললেন। আদুরে গলায় বললেন, সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তুই এখানে বসে থাকবি। নড়তে পারবি না।

শুভ্র বলল, আচ্ছা।

জাহানারা বললেন, তুই তো প্রায়ই তোর বাবার সঙ্গে গুটুর গুটুর করে গল্প করিস। আমার সঙ্গে কর।

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, কোন বিষয়ে গল্প শুনতে চাও মা?

জাহানারা বললেন, যে-কোনো বিষয়ে। শুধু তোর বাবার সঙ্গে যে-সব গল্প করিস সে-সব না। ফিজিক্সের কচকচানি না।

স্বপ্নের গল্প বলব?

স্বপ্নের আবার কী গল্প?

শুভ্র বলল, নিজেকে নিয়ে আমি যে-সব স্বপ্ন দেখি।

জাহানারা আগ্রহ নিয়ে বললেন, নিজেকে নিয়ে তুই কী স্বপ্ন দেখিস?

শুভ্র বলল, নিজেকে নিয়ে মানুষ একেক বয়সে একেক রকম স্বপ্ন দেখে— এখন আমি যে স্বপ্ন দেখি তা হলো সমুদ্রে একটা ছোট্ট দ্বীপ। গাছপালায় ঢাকা। একদিকে ঘন জঙ্গল। সমুদ্রে যে দিকে সূর্য ডুবে দ্বীপের সেই দিকটায় বেলাভূমি। রবিনসন ক্রুশোর মতো আমি সেই দ্বীপে একা থাকি।

একা থাকিস?

হ্যাঁ একা। আমার একটা ছোট্ট ঘর আছে। ঘরভর্তি শুধু বই। যখন ইচ্ছা হয় বই পড়ি। যখন ইচ্ছা হয় সমুদ্রে পা ডুবিয়ে পাথরের উপর বসে থাকি। যখন ইচ্ছা হয় জঙ্গলে হাঁটতে যাই।

জাহানারা বললেন, রান্নাবান্না কে করে?

রান্নাবান্নার কথাটা ভাবি নি মা। স্বপ্নের মধ্যে রান্নাবান্না, বাথরুম জাতীয় ব্যাপার আনতে নেই। এইসব হচ্ছে রিয়েলিটি। ড্রিমের সঙ্গে রিয়েলিটি মেশাতে নেই।

একা একা তোর সেই দ্বীপে কতক্ষণ ভালো লাগবে?

শুভ্র বলল, বাস্তবে হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু স্বপ্নে ভালো লাগবে।

জাহানারা বললেন, তুই যেমন অদ্ভুত, তোর স্বপ্নগুলিও অদ্ভুত।

শুভ্র বলল, প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তাদের স্বপ্নও আলাদা। আমার স্বপ্নের সঙ্গে তোমার স্বপ্ন কখনো মিলবে না। তোমার স্বপ্ন কী মা বলো তো।

জাহানারা বললেন, আমার কোনো স্বপ্ন নেই।

শুভ্র বলল, অবশ্যই তোমার স্বপ্ন আছে। মনে করে কোনো একদিন আমাকে বলবে।

আমার স্বপ্ন জেনে তুই কী করবি?

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজের স্বপ্ন কী ভাবার চেষ্টা করলেন। কোনো কিছুই মাথায় আসছে না। তাহলে কি তার কোনো স্বপ্ন নেই? তিনি একজন স্বপ্নহীন মানুষ?

মোতাহার হোসেন রাতে একবাটি স্যুপ এবং একটা কলা খান। থাই ক্লিয়ার স্যুপ চায়নিজ রেস্টুরেন্ট থেকে আসে। তাদের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। ডিনার তিনি শেষ করেন ঠিক সাড়ে ন'টায়। ডিনারের পর আধ ঘণ্টা ছাদে হাঁটেন। দশটায় এসে বসেন ধোঁয়াঘরে। চিনি দুধ বিহীন এক কাপ লিকার চা এবং দিনের শেষ সিগারেটটা খান। এই সময়টা তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখা যায় জাহানারা এসে পাশে বসেন। সাংসারিক কথাবার্তা শুরু করেন। মোতাহার হোসেন খুবই বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু বলেন না। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন মোতাহার হোসেন ভাবেন— থাক, আজ বাদ থাক। আবার যখন এরকম ঘটনা ঘটবে তিনি বলবেন। আবারো ঘটে, কিন্তু বলা হয় না।

মোতাহার হোসেন সিগারেট ধরিয়ে প্রথম টান দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জাহানারা এসে সামনে বসলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কথাটা দিনে বললে কেমন হয়?

কথাটা আমাকে এখনি বলতে হবে।

মোতাহার হোসেন চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, বলো কী কথা?

জাহানারা বললেন, তুমি আমাকে একটা দ্বীপ কিনে দেবে?

মোতাহার হোসেন চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, কী কিনে দেব?

জাহানারা বললেন, দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরে ইনি মিনি অনেক দ্বীপ আছে। এরকম একটা কিনে দেবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, দ্বীপ দিয়ে কী করবে ?

জাহানারা বললেন, আমি কী করব সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে কিনে দিতে বলেছি তুমি দেবে।

মোতাহার হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন দ্বীপ কেনা শাড়ি-গয়না কেনার মতো ব্যাপার।

তোমার কাছে তাই।

মোতাহার হোসেন হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন। দিনের শেষ সিগারেট আরাম করে টানতে হয়। তিনি ঠিক করলেন জাহানারা চলে যাবার পর আরেকটা সিগারেট ধরাবেন।

জাহানারা বললেন, হ্যাঁ না তুমি তো কিছুই বলছ না ?

মোতাহার হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ আমার শরীরটা ভালো না। অফিসে প্রেসার মাপিয়েছি। ডাক্তার বলেছে প্রেসার হাই। এখন আবার মাথা ধরেছে। দ্বীপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরে কথা বলি ?

দ্বীপ নিয়ে কথা বলতে না চাইলে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বলি ?

আচ্ছা বলো।

শুভ্র'কে বিয়ে দিলে কেমন হয় বলো তো। সুন্দর একটা মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘুরঘুর করবে। শুভ্র'র বয়স চব্বিশ হয়েছে, বিয়ে তো এখন দেয়া যায়। যায় না ?

হ্যাঁ যায়।

জাহানারা আগ্রহ নিয়ে বললেন, মনে কর ওরা দু'জন ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করছে, আমি হঠাৎ উপস্থিত হলাম। লজ্জা পেয়ে ওরা দু'জন দু'দিকে সরে গেল। ইন্টারেস্টিং না ?

মোতাহার হোসেন বললেন, তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং। আমার কাছে অবশ্যি মনে হচ্ছে না।

দ্বীপে ওদের দু'জনকে রেখে আমরা জাহাজ নিয়ে চলে এলাম। দ্বীপে কোনো জনমানব নেই, শুধু ওরা দু'জন।

মোতাহার হোসেন বললেন, আবার দ্বীপ ? তোমার অন্য প্রসঙ্গে কথা বলার কথা।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তার এখন স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। শুভ্র'র ঘরে বাতি জ্বলছে। জাহানারার মনে হলো ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলে কেমন হয় ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হলো। বিগ ব্যাঙ্গ, স্পেস-টাইম, ব্লাক হোল সংক্রান্ত হাবিজাবি। শুভ্র এমনভাবে গল্প করে যেন সে চোখের সামনে ব্লাক হোল দেখতে পাচ্ছে। সায়েন্সের হাবিজাবি গল্পের মাঝখানে বিয়ের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। কী ধরনের মেয়ে শুভ্র'র পছন্দ সেটা জানা দরকার।

শুভ্র কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। জাহানারা যে ঘরে ঢুকেছেন, শুভ্র বুঝতে পারছে না। তার সমস্ত মনোযোগ কম্পিউটারের পর্দার দিকে। হালকা সবুজ রঙের আলো শুভ্র'র মুখে পড়েছে। তাকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। জাহানারা ছেলের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

এই শুভ্র!

শুভ্র মা'র দিকে তাকিয়ে হাসল। জাহানারা সবসময় লক্ষ করেছেন— শুভ্র'কে ডাকলে সে প্রথম যে কাজটা করে তা হলো ঠোঁট টিপে হাসে। শুধু তার সঙ্গেই হাসে, না সবার সঙ্গে হাসে— এটা তিনি জানেন না।

কম্পিউটারটা বন্ধ করবি ?

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে অফ বাটন টিপে দিল। শুভ্র'র মুখের উপর থেকে হালকা সবুজ আলোটা চলে গেছে। এখন জাহানারার মনে হলো কম্পিউটারটা অন থাকলেই ভালো হতো।

শুভ্র বলল, মা বোস।

জাহানারা বসতে বসতে বললেন, শুভ্র, তুই বিয়ে করবি ?

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ করব।

জাহানারার মনে হলো অন্য যে-কোনো ছেলে হলে এই প্রশ্নের উত্তরে লজ্জা পেত। জবাব দিত না। শুভ্র অন্যদের মতো না।

জাহানারা আদুরে গলায় বললেন, তোর কীরকম মেয়ে পছন্দ ?

শুভ্র বলল, লিসনার-টাইপ মেয়ে।

জাহানারা বললেন, লিসনার-টাইপ মানে কী ?

শুভ্র বলল, কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা খুব মন দিয়ে কথা শুনে। এদের বলে লিসনার। ওদের সঙ্গে গল্প করে খুব আরাম।

জাহানারা বললেন, আমি কি লিসনার ?

শুভ্র বলল, না, তুমি লিসনার না।

আমার সঙ্গে গল্প করে আরাম নেই ?

না।

তোর বাবা কি লিসনার ?

উহুঁ। বাবা খুব মন দিয়ে কথা শুনেন এরকম ভাব করেন। কিন্তু আসলে শুনেন না। তিনি তখন অন্য কিছু ভাবেন।

জাহানারা বললেন, এই বাড়িতে লিসনার-টাইপ কেউ আছে ?

শুভ্র বলল, সকিনা মেয়েটা লিসনার।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে বললেন, একটা কাজের মেয়ে হয়ে গেল লিসনার ? তাকে তো কথা শুনতেই হবে। সে তো মুখের উপর হড়বড় করে কথা বলবে না।

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন মা ?

জাহানারা বললেন, তোর উল্টাপাল্টা কথা শুনে রাগ লাগছে। আমাকে রাগানোর জন্যে তুই কথাগুলি ইচ্ছা করে বলিস কি-না কে জানে। আমি লক্ষ করেছি তোর সবসময় একটা চেষ্টা থাকে আমাকে রাগিয়ে দেবার।

শুভ্র হাসছে। জাহানারা জানেন ছেলের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তার রাগ পড়ে যাবে। তিনি অন্যদিকে তাকালেন। ছেলে হাসুক তার মতো। হাসি দেখার দরকার নেই। জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে রওনা হলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন ছেলে তাকে রাগ করে চলে যেতে দেবে না। ডেকে আবার চেয়ারে বসাবে। শুভ্র তা করল না। সে আবারো কম্পিউটার চালু করল। জাহানারা হঠাৎ মনে এত কষ্ট পেলেন যে চোখে পানি এসে গেল।

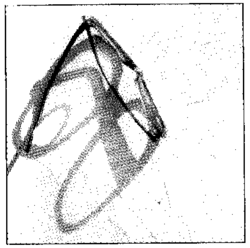

বসদের অফিসঘর থাকে এক রকম, আবার সুপার ডুপার বসদের অফিসঘর থাকে অন্যরকম। তাদের অফিসঘরে পা দেয়া মাত্রই চাপা গলায় বলতে ইচ্ছা করে— খাইছে রে! তারপরেই মনে হয়— আমি কোথায় ঢুকলাম ? জাহাজের ইঞ্জিনঘরের শব্দের মতন শব্দ (তবে অনেক হালকা) মাথার ভেতর পিনপিন করতে থাকে। সারাক্ষণ অস্বস্তি— শব্দটা কোত্থেকে আসছে ? শব্দটা যে এসি থেকে আসছে এটা বোঝা যায় না। কারণ এই জাতীয় বসদের ঘরের এসি লুকানো থাকে। চোখে দেখা যায় না। ঘর থাকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। চৈত্র মাসের গরমের দিনে মাঘ মাসের শীত। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অন্যপ্রান্তে যিনি বসে থাকেন তার চোখও থাকে ঠাণ্ডা। ঘরে আলো থাকে কম— চায়নিজ রেস্টুরেন্ট ধরনের আলো। দর্শনার্থীদের জন্যে সোফা থাকে। সেই সোফাও সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মতো বিশাল। বসামাত্র শরীর ডুবে যায়। পা শুধু ভেসে থাকে। চোখের সামনে বকের ঠ্যাং-এর মতো দুটো লম্বা পা নিয়ে বসে থাকতে অস্বস্তি লাগে।

মনজু অস্বস্তি নিয়ে সোফায় বসে আছে। তার সামনের ভদ্রলোকের নাম মোতাহার হোসেন। সিনেমার বিজ্ঞাপনে যেমন থাকে মেগাস্টার, উনিও মেগাবস। জাহাজের ব্যবসা, গার্মেন্টসের ব্যবসা, সুতার কারখানা, রঙের কারখানা... হুলুস্থুল। শুধু হুলুস্থুল না, মেগা হুলুস্থুল। মনজু এই ভদ্রলোকের জন্যে সোমেশ্বর হাই স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার সাহেবের একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। গত চারদিন ধরে এই চিঠি নিয়ে সে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছে। দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। অফিসের লোকজন কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না। মনজু বলেছে, ভাই, আমি কোনো চাকরির জন্যে আসি নাই। কোনো সাহায্যের আবেদনও না। হেডমাস্টার সাহেবের একটা ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে এসেছি। মোতাহার হোসেন সাহেব উনার ছাত্র। বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্র। চিঠিতে উনি গোপন কিছু কথা তাঁর ছাত্রকে লিখেছেন। প্রাইভেট কথা।

অফিসের লোক (মনে হয় মেগাবসের সেক্রেটারি) শুকনা গলায় বলল, চিঠি রেখে যান, আমরা স্যারের কাছে পৌঁছে দেব।

মনজু বলল, এই চিঠি আমাকে হাতে হাতে দিতে হবে। স্যারের বিশেষ

নির্দেশ। চিঠি পড়ার সময় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। চিঠি পড়ার পর আমাকে দু'একটা প্রশ্ন আপনার স্যার করলেও করতে পারেন।

লোক বলল, আপনার ঠিকানা রেখে যান। চিঠি পড়ার পর স্যার যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান আমরা আপনাকে খবর দেব।

উনি কি কারো সঙ্গে দেখা করেন না ?

না।

মনজু মেগাবসের বাড়িতে গিয়েছে। ওয়ারিতে হুলস্থুল টাইপ বাড়ি। মেগা হাউস! জেলখানার গেটের চেয়েও উঁচু দেয়াল দিয়ে বাড়ি ঘেরা। শ্বেতপাথরের নেমপ্লেটে ইংরেজিতে লেখা Maya Lodge. সব বাড়ির গেটে একজন দারোয়ান থাকে— এই বাড়ির গেটে তিনজন দারোয়ান। তাদের এক কথা, আপনি অফিসে যান। বাড়িতে কারোর ঢোকার অনুমতি নাই।

মনজু বলল, মন্ত্রী মিনিস্টাররাও তো মাঝে মধ্যে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন।

তিন দারোয়ানের একজন (চশমা চোখের দারোয়ান। দারোয়ানদের চোখে চশমা দেখা যায় না। ব্যাটা বোধহয় জ্ঞানী) বলল, বিরক্ত করবেন না। বিরক্ত করলে লাভ হবে না। অফিসে যান।

মনজু বলল, কোন অফিসে যাব ? উনার তো অফিস অনেকগুলি।

চশমা চোখের দারোয়ান বলল, সেটা আপনার বিবেচনা। ভাই, বিরক্ত করবেন না।

কোন অফিসে গেলে দেখা করা সহজ ?

জানি না।

দেখা করা আমার স্বার্থে না, উনার স্বার্থে। উনারই উপকার হবে, আমার কিছু না।

চশমাওয়ালা দারোয়ান বলল, প্যাঁচাল বন্ধ করেন।

মনজু প্যাঁচাল বন্ধ করে চলে এসেছে এবং ফন্দি ফিকির করে বাঘের খাঁচায় ঢুকেও পড়েছে। কীভাবে ঢুকল সে এক ইতিহাস। এখন মনে হচ্ছে খাঁচায় ঢুকে কোনো লাভ হবে না। গত চারদিনের পরিশ্রম বুড়িগঙ্গার ঘোলা পানিতে পড়েছে। বুড়িগঙ্গার কোনো উনিশ বিশ হয় নি। তার নিজের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে।

যে ব্যক্তিটির সামনে সে বসে আছে সেই ব্যক্তিটিকে তেমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরে আছে। পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি নেই। কাপড়টাও খুব দামি বলে মনে হচ্ছে না। সহজ মানুষ বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে চল্লিশ মিনিট যে লোক কোনোরকম নড়াচড়া না করে ঝিম ধরে বসে থাকতে পারে সে কোনো

[illegible] পাত্তাও না। মনজুর ধারণা ছিল অফিসের বড় সাহেবদের কাছে ক্রমাগত লোকজন আসতে থাকে। বড় সাহেব তাদের সবাইকে ধমকাতে থাকেন। টেলিফোন বাজতে থাকে, তিনি টেলিফোন ধরতে থাকেন। টেলিফোনেও ধমক ধামক করতে থাকেন। অতি রূপবতী স্টেনোরা একটু পর পর এসে নোট নেয়। [illegible] দিয়ে যায়। এই বড় সাহেব সে-রকম না। চল্লিশ মিনিটে কেউ তার কাছে আসে নি। কোনো টেলিফোন বাজে নি। উনাকে সম্ভবত টেলিফোন করাও নিষেধ।

মনজু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফিসের আসবাবপত্র দেখতে থাকল। এই কাজটা সে আগেও করেছে। আরেকবার করতে ক্ষতি নেই। তার সামনে আজকের খবরের কাগজ আছে। ইচ্ছা করলে সে খবরের কাগজ পড়তে পারে। কিন্তু সেটা মনে হয় ঠিক হবে না। বড় সাহেবের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়াটা অবশ্যই বেয়াদবি হবে। খুব বড়লোকদের মনে মনে গাল দিলে আরাম লাগে। মনজু একবার মনে মনে বলল, শালা মদারু! তেমন কোনো আরাম পেল না, বরং মনে হলো ব্যাটা তার মনের কথা বুঝে ফেলেছে। যখন সে 'শালা মদারু' বলেছে তখন চট করে তাকিয়েছে।

মনজুর এখন মনে হচ্ছে হেডমাস্টার সাহেবের চিঠিটা না দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সোমেশ্বর হাইস্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার বাবু তারানাথ শীলের সঙ্গে তার দেখাই হয় নি। চিঠিটা সে নিজেই ঢাকায় বসে লিখেছে। সে শুধু জানে এই মেগাবস তারানাথ শীলের ছাত্র ছিলেন। তিনি মোতাহার হোসেনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হেডমাস্টার সাহেবের চিঠিতে দু'জনের গতি হয়েছে। তার যদি গতি হয় তাহলে দানে দানে তিন দান হবে।

বড় সাহেবের ডান দিকের জানালায় ভ্যানিশিং ব্লাইন্ড লাগানো। সময় কাটানোর জন্যে টুকরাগুলি গোনা যেতে পারে। যদি জোড় সংখ্যা হয় তাহলে তার লাভ হবে। বেজোড় হলে হবে না। গোনার সময় মনজু মনে মনে আরেক দফা গালি দিল, এই শুয়োর! আমি যে এতক্ষণ বসে আছি তোর চোখে পড়ছে না ? তুই মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করিস না। কাপড় খুলে তোর পাছায় কচ্ছপ দিয়ে কামড় দেওয়াব।

এই, এদিকে এসো!

মনজু চমকে উঠল। তাকেই কি ডাকা হচ্ছে ? হ্যাঁ, বড় সাহেব তো তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এখন তার কী করা উচিত ? প্রথম ঘরে ঢোকার সময় সে একবার সালাম দিয়েছে। আবার কি দেওয়া উচিত ? সালাম দুই তিনবার দিলে কোনো দোষ হবে না তো ?

স্যার, স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। তোমার ব্যাপার কী ?

একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম স্যার।

কার চিঠি ?

সোমেশ্বর হাই স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার বাবু তারানাথ শীলের চিঠি। উনি বলেছেন চিঠিটা আপনাকে হাতে হাতে দিতে।

মোতাহার হোসেন বেশ আগ্রহ করেই চিঠি নিলেন। খাম খুলে সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। মনজু একমনে দরুদে শেফা পড়ছে। কঠিন পরিস্থিতিতে এই দোয়া পাঠ করলে পরিস্থিতি সহজ হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহ এই দরুদ পাঠ করে পরিস্থিতি তার অনুকূলে যায়। চিঠি পড়তে গাধাটার এতক্ষণ লাগছে কেন ? বানান করে করে পড়ছে ? লেখাপড়া জানে না না-কি ?

এক পাতার চিঠিতে লেখা আছে—

বাবা মোতাহার,

পত্রবাহক আমার অতি প্রিয় একজন। ভদ্র পরিবারের ভালো এবং সৎ ছেলে। তাহা কর্তৃক আমি নানানভাবে উপকৃত হইয়াছি। এখন সে বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার দুঃসময়ে আমি কিছু সাহায্য করি ঈশ্বর আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে দিয়াছেন। তুমি যদি আমার এই অতি প্রিয় ছেলেটির জন্য কিছু করিতে পার তাহা হইলে আমি বৃদ্ধ বয়সে বড়ই শান্তি পাইব। শরীর ভালো যাইতেছে না। পরপারে ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুতি নিতিছি। তুমি ভালো থাকিবে। বৌমাকে আমার স্নেহ এবং তোমার পুত্র শুভ্র'র প্রতি আন্তরিক শুভকামনা।

ইতি
তোমার শিক্ষক
তারানাথ শীল

মোতাহার হোসেন চিঠিটা টেবিলে রেখে অ্যাসট্রে দিয়ে চাপা দিতে দিতে বললেন, চিঠিতে লেখা তুমি স্যারের অতি প্রিয় একজন। স্যার তোমাকে দিয়ে উপকৃত হয়েছেন। তুমি কী করেছ তার জন্যে ?

মনজু বলল, তেমন কিছু করি নাই স্যার। টুকটাক সেবা। পাশে বসে গল্পগুজব। উনি মহৎপ্রাণ মানুষ। আমার ছোট কাজটাকেই বড় করে দেখেছেন।

মোতাহার হোসেন বললেন, চিঠিটা কি উনার লেখা ?

মনজুর বুক ধ্বক করে উঠল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, স্যার, উনার প্যারালাইসিস। উনি হাতে কিছু লিখতে পারেন না। উনি ডিকটেশন দিয়েছেন, অন্য একজন লিখেছে।

অন্য একজনটা কে, তুমি ?

জি স্যার।

মোতাহার হোসেন এই পর্যায়ে এসে কিছুক্ষণ সরাসরি মনজুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনজু চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝেছে দরুদে শেফা কাজ করে নি। আজ তার খবর আছে। এই লোকের সামনে মিথ্যা কথা বলাও সম্ভব না।

তোমার নাম যেন কী ?

শফিকুল করিম। ডাক নাম মনজু।

আমার তো ধারণা সোমেশ্বর স্কুলের রিটায়ার্ড কোনো হেডমাস্টারের সঙ্গে তোমার দেখাই হয় নি। আমার ধারণা কি ঠিক ?

মনজু দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি স্যার ঠিক।

পড়াশোনা কী ?

বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, পাশ করতে পারি নি।

পুলিশের কাছে কখনো ধরা পড়েছ ? হাজত খেটেছ ?

জি-না স্যার।

তুমি বাইরে যাও। অপেক্ষা কর। তোমাকে পরে ডাকব।

স্যার, আমি বরং চলে যাই ?

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। অ্যাসট্রে দিয়ে চাপা দেয়া চিঠি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। টেলিফোন তুলে কাকে যেন কী বললেন। মনজু বাঘের খাঁচা থেকে বের হয়ে এলো। ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকার পরেও তার কপাল ঘামছে। বুক ধরফড় করছে। এই মুহূর্তে পরপর দুটা সিগারেট খেয়ে তাকে শরীর ঠিক করতে হবে। অফিসে সিগারেট খাওয়া যাবে না। তাকে চলে যেতে হবে রাস্তায়। রাস্তার পাশের ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলি ভালো চা বানায়। মিষ্টি বেশি দিয়ে এক কাপ চা, সঙ্গে দুটা সিগারেট। দুটা সিগারেট পর পর খাবার আলাদা নাম আছে— মামা-ভাগ্নে সিগারেট। প্রথমটা মামা সিগারেট, এতে নেশার ক্ষেত্র তৈরি হয়। দ্বিতীয়টা ভাগ্নে সিগারেট। তখন নেশাটা জমে।

মেগাবস তাকে থাকতে বলেছেন। কেন বলেছেন বোঝা যাচ্ছে না। কোলে বসিয়ে আদর করার জন্যে নিশ্চয়ই থাকতে বলেন নি। কিছুক্ষণ শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। মাথার ঘ্রাণ নিলেন। তারপর বললেন, বাবা যাও আজ থেকে চাকরিতে জয়েন কর। মাসে বেতন পাঁচ হাজার টাকা। কোয়ার্টার ফ্রি,

মেডিকেল ফ্রি। দুই ঈদে ফুল বোনাস। যাতায়াতের জন্যে কোম্পানি থেকে গাড়ি পাবে। আর বাবা শোন, দুপুরে আমার সঙ্গে খাও। আমি আবার একা খানা খেতে পারি না।

মনজুর ধারণা মেগাবস তাকে থাকতে বলেছেন পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্যে। এইসব অতি বড়লোকদের সঙ্গে থানাওয়ালাদের খুব খাতির থাকে। খবর দিলেই ওসি সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। দাঁত কেলিয়ে বলেন, স্যার, আপনার জন্যে কী করতে পারি? সমস্যা কী হয়েছে বলেন। ঠিক করে দিয়ে যাই।

ওসি সাহেব এই ধরনের কথা বললে মেগাবস বলবেন, এই ছেলেটাকে থানায় নিয়ে যান। আমার সঙ্গে ফ্রডবাজি করতে এসেছে। দু'এক রাত হাজতে রেখে দেন। তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। সমাজের একটা উপকার হবে।

থানাওয়ালারা সমাজের উপকারের জন্যে মোটেই ব্যস্ত না, তবে মেগাবসের কথা বলে কথা।

মনজুর চা খাওয়া হয়েছে। মামা-ভাগ্নে সিগারেট খাওয়াও হয়েছে। এখন সে কী করবে বুঝতে পারছে না। মেগাবস তাকে থাকতে বলেছেন বলেই বোকামি করে অফিসে ঢুকে পুলিশের কাছে ধরা খাওয়ার কোনো মানে হয় না। ভদ্রলোক যে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন এটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, পুলিশের হাতে কখনো ধরা পড়েছ, হাজত খেটেছ? এই প্রশ্নের মানে একটাই— হাজত খেটে দেখ কেমন লাগে।

এখন সে কী করবে? যাত্রাবাড়িতে ফিরে যাবে? গত সাতদিন ধরে সে যাত্রাবাড়িতে আছে। তার মামা ইকবাল সাহেবের বাড়িতে। আপন মামা না। তার বড় মামির ছোট ভাই। লতায়পাতায় মামা। ভদ্রলোক এজি অফিসের সিনিয়ার অ্যাসিসটেন্ট। ভালো মানুষ টাইপ জিনিশ। মুখের উপর বলতে পারছেন না— এক সপ্তাহ হয়ে গেল। আর কতদিন থাকবে? মুখের উপর বলতে না পারলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিকই বলেছেন। যেমন গত পরশু দিন বললেন, বুঝলে মনজু, দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন আসলে আমার ভালো লাগে। আত্মীয়স্বজন ছাড়া বাঙালির আছে কী। এই যে কথায় আছে— 'এক লতায় টান দিলে দশ লতা নড়ে। চৈত্র মাসে মেঘ করে বৈশাখ মাসে পড়ে।' তবে সমস্যা হলো আমার অতি ছোট বাসা। একটা বাথরুম। রুনু ইন্টারমিডিয়েট দিবে— নিরিবিলি ছাড়া পড়তে পারে না।

মনজু মামার কথা শেষ হবার আগেই বলেছে, অবশ্যই অবশ্যই। মামা, আপনি অতি ভালোমানুষ বলেই আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করেন। আমি

আপনার জায়গায় হলে দরজায় নোটিশ ঝুলিয়ে রাখতাম— 'আত্মীয়স্বজন! পথ দেখো।' সিন্দাবাদের ভূতের মতো আত্মীয়স্বজন কাঁধে নিয়ে দিনের পর দিন পার করা উচিত না। একেবারেই উচিত না। এটা আসলে ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে। ফৌজদারি ক্রাইম।

মনজু তার নিজের ব্যাপারে ছোট্ট একটা চাল চেলেছে। সে বলেছে— সে ঢাকায় এসেছে, কারণ এম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মোতাহার হোসেন সাহেব তাকে একটা চাকরি দিয়েছেন। মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট টঙ্গি না চিটাগাং এটা জানতে পারছে না বলে চাকরিতে জয়েন করতে পারছে না। কারণ মোতাহার সাহেব চলে গেছেন জাপানে। এক দুই দিনের মধ্যে তার ফেরার কথা। এই মিথ্যা বলার কারণ কিছু না, নিজের দাম সামান্য বাড়ানো। বেকার একটা ছেলেকে বাড়িতে পোষা এক কথা আর দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি আছে এমন একজনকে পোষা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

ইকবাল সাহেবের স্ত্রী স্বামীর মতোই বোকাসোকা মানুষ। তাকে কায়দা করতে মনজুর মোটেই বেগ পেতে হয় নি। প্রথম দিন থেকেই মনজু তাকে মা ডাকছে। কারণ এই ভদ্রমহিলা না-কি অবিকল তার মৃতা মায়ের মতো।

মনজু কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, মা, আপনাকে আমি তাঁর ছবি দেখাব। ছবি দেখালে বুঝবেন আমার কথা কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা। আপনার চেহারা যে শুধু আমার মা'র মতো তা-না, আপনার চালচলন কথাবার্তাও আমার মা'র মতো। আমার মা'র মতোই আপনি নরম স্বভাবের। তবে আমার মা আপনার মতো সুন্দরী ছিলেন না। আপনার গায়ের রঙ তো আগুনের মতো। আমার মা ছিলেন শ্যামলা।

ভদ্রমহিলা খুবই খুশি হয়ে গেলেন। লাজুক গলায় বললেন, কী যে তুমি বলো! আমার আবার গায়ের রঙ। গায়ের রঙ ময়লা বলে বিয়েই হচ্ছিল না।

মনজু চোখ কপালে তুলে বলেছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! মা, আপনি এইসব কী বলেন? আপনার গায়ের রঙ ময়লা!

রঙ আরো ভালো ছিল। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় টাইফয়েড হলো, তখন রঙ নষ্ট হয়ে গেল।

নষ্ট হবার পরে এই অবস্থা? ইয়া গাফুরুর রহিম। মা শুনেন, কাজের কথা বলি। আমি বাইরের একজন মানুষ, আপনাদের ছোট্ট সংসারে উপদ্রবের মতো উপস্থিত হয়েছি। দু'এক দিনের মধ্যে আমরা পোস্টিং হবে। মনে হচ্ছে চিটাগাং নিয়ে ফেলবে। আমাদের মূল অফিস চিটাগাং-এ। এই দু' একদিন আমি আপনাদের বসার ঘরের সোফায় শুয়ে থাকব যদি অনুমতি দেন।

অবশ্যই থাকবে। অনুমতির কী আছে ?

আরেকটা কথা মা— যদি চিটাগাং-এ পোস্টিং হয় তাহলে কিন্তু আমি আপনাদের সবাইকে একবার চিটাগাং নিয়ে যাব। কক্সবাজার দেখায়ে নিয়ে আসব। নিজের মায়ের কোনো সেবা তো করতে পারি নাই। মাতৃঋণ শোধ হয় নাই। দেখি আপনাকে দিয়ে যদি...।

বোকাসোকা বাবা মা'দের ছেলেমেয়েরা বিচ্ছু হয়। আর ছেলেমেয়ে বলতে যদি একটাই হয় তাহলে সেটা হয় চিকন বিচ্ছু। বাইরের চেহারা থাকবে সরলটাইপ, বুদ্ধি থাকবে চিকন। মসলিনের সূতা চোখে দেখা যায় না এমন চিকন। ইকবাল সাহেবের মেয়ে রুনু যে চিকন বুদ্ধির মসলিন এটা ধরা পড়ল চতুর্থ দিনে। সে কলেজে যাবে অ্যাডমিট কার্ড আনতে। মনজু সঙ্গে গেছে রিকশা ঠিক করে দিতে। রুনু বলল, আপনাকে আসতে হবে না। আমি রিকশা ঠিক করতে পারি।

মনজু বলেছে, রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে হ্যাচোড় প্যাচোড় করা তোমার মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। আমি আছি কী জন্যে ?

রুনু বলল, আপনি তো আর সারা জীবন থাকবেন না। তখন কী হবে ? না-কি আপনার দীর্ঘ পরিকল্পনা ?

এই বলেই মেয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। চোখের দৃষ্টি দেখেই মনজুর খবর হয়ে গেল। এই মেয়ে সহজ পাত্র না। এর ক্যাচাল আছে। মনজু বলল, আমি আর এক দুই দিনের বেশি আছি বলে মনে হয় না। আজ ঢাকা অফিসে খোঁজ করব। বড় স্যার যদি জাপান থেকে আজ চলে আসেন তাহলে কালকেই আমাকে চিটাগাং রওনা হতে হবে।

রুনু বলল, আপনার পোস্টিং কি চিটাগাং-এ ?

মনজু বলল, চিটাগাং-এ হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের কোম্পানির ইংল্যান্ডেও অফিস আছে। আবার কাছের দেশ সিঙ্গাপুরেও আছে। আমাকে তো আর শুরুতেই বিদেশে পোস্টিং দিবে না।

রুনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

মনজুর বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগলেও সে উদাস গলায় বলার চেষ্টা করল, কোনটা মিথ্যা ?

রুনু বলল, আপনি যা বলছেন সবই মিথ্যা। আপনি ঢাকায় এসেছেন চাকরির খোঁজে। আপনার ইচ্ছা নানান ধরনের মিথ্যা-টিথ্যা বলে যতদিন সম্ভব আমাদের বাড়িতে থাকা। যখন আর থাকতে পারবেন না তখন আরো একটা বড় মিথ্যা বলে অন্য কোথাও যাবেন। সেখানেও মিথ্যা বলবেন।

এই তোমার ধারণা ?

ধারণা না, এটাই সত্যি। বাবা-মা দু'জনই সোজা সরল মানুষ বলে আপনার মিথ্যাগুলি ধরতে পারছেন না।

তুমি মহাচালাক বলে ধরে ফেলেছ ?

রুনু স্পষ্ট করে বলল, হ্যাঁ। তবে আপনার ভয় নেই, আপনার মিথ্যা আমি বাবা-মা'কে ধরিয়ে দেব না। আপনি তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে যতদিন ইচ্ছা আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন।

আমার প্রতি তোমার এত দয়ার কারণ কী ?

আপনি মহাবিপদে পড়েছেন, এই জন্যেই আপনার প্রতি আমার দয়া।

এই পর্যায়ে মনজুর মনে হলো মেয়েটার কাছে সত্যি স্বীকার করে ফেলাই ভালো। অন্তত একজন নিজের মানুষ থাকল। মেয়েটা হৃদয়হীনা না। মায়া-মমতা আছে। মনজু সত্যি কথা বলতে শুরু করার আগেই রিকশা পাওয়া গেল। রুনু রিকশায় উঠতে উঠতে আবারো বলল, কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

মনজু মনে মনে বলল, এই পুচকি, তোর ভালো লাগার উপরে দুনিয়া চলবে না। এই দুনিয়ায় সত্য-মিথ্যা দুই ভাই। দুনিয়া চলে দুই ভাইয়ের ইশারায়। তুই আরেকটু বড় হ। প্রেমে ফ্রেমে পড়। তারপর দেখবি কী রকম হড়বড় করে মিথ্যা বলবি। তখন একটা সত্যি কথা বললে বিশটা বলবি মিথ্যা।

মামা-ভাগ্নে সিগারেটের পর মনজু আরেকটা সিগারেট ধরাল। এই সিগারেটের নাম চিন্তা সিগারেট। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সিগারেট। চিন্তা সিগারেট এক জায়গায় বসে টানার সিগারেট না। এই সিগারেট হাঁটাহাঁটি করতে করতে টানতে হয়।

এখন মনজুর প্রধান চিন্তা সে কী করবে ? মেগাবস তাকে বসতে বলেছিলেন। সে কি অফিসে ফিরে যাবে ? মেগাবস যদি তাকে পুলিশে দিতে চাইতেন তাহলে তখনই দিতে পারতেন। বসতে বলতেন না। লাক ট্রাই করতে অসুবিধা কী ? মেগাবস যদি তাকে ডেকে পাঠান তাহলে সে বলবে— স্যার, আপনার কাছ থেকে খালি হাতে যদি ফিরি তাহলে মৃত্যু ছাড়া আমার পথ নেই। এই দেখেন স্যার, আমি বিশটা ঘুমের ট্যাবলেট কিনে পকেটে রেখে দিয়েছি। এক পাতা ঘুমের ট্যাবলেট কিনতে কত টাকা লাগবে কে জানে। তার কাছে এই মুহূর্তে আছে সাতান্ন টাকা এবং সাতটা সিগারেট। সাতটা সিগারেটে আজকের দিন চলবে না। আরেক প্যাকেট কিনতে হবে। ঘুমের ওষুধ কেনার চিন্তা বাদ

দিতে হবে। মেগাবসকে অন্য কিছু বলতে হবে। যেমন— স্যার, আপনার কাছ থেকে যদি খালি হাতে ফিরি তাহলে চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়া ছাড়া আমার পথ নেই।

মোতাহার হোসেন মনজুকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মনজু এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে একমনে দোয়া ইউনুস পড়ে যাচ্ছে। মহাবিপদের সময় এই দোয়া পড়তে হয়। তার কাছে মনে হচ্ছে সে মহাবিপদেই আছে।

মনজু!

জি স্যার।

আমার ছেলের নাম তুমি জানো। শুভ্র! চিঠিতে এই নামের উল্লেখ আছে। আমার ছেলেটা শারীরিক এবং মানসিক দুইভাবেই অন্য দশজনের থেকে আলাদা। তার চোখ খুব খারাপ। চশমা পরেও সে যে খুব ভালো দেখে তা আমার মনে হয় না।

মনজু মনে মনে বলল, বক্তৃতা বন্ধ করে আসল কথা বল। তোর ছেলে চোখে দেখে না তাতে আমার কী? সে আন্ধা হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নাই। বাপের টাকার বিছানায় হাগা-মুতা করবে। দশটা থাকবে নার্স। প্রত্যেকটা দেখতে সুন্দর। এরা তোর ছেলেকে শুচু করাবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, চোখের সমস্যা ছাড়াও তার শরীর দুর্বল। ছোটবেলা থেকেই অসুখবিসুখে ভোগে। তার মা তাকে আলাদা করে বড় করেছেন বলে পৃথিবীর জটিলতা সে কিছুই জানে না। তার জগৎটা হলো বইপত্রের। সে দিনরাত বই পড়ে। আমি আমার ছেলের জন্যে একজন সার্বক্ষণিক চালাক চতুর সঙ্গী খুঁজছি। শুভ্র যখন বাইরে যাবে ওই সঙ্গী থাকবে তার সঙ্গে।

মনজু মনে মনে বলল, শালা বুড়া কুমির, তুই ছেলের জন্যে চাকর খুঁজছিস? আমার চেহারা কি দেখতে চাকরের মতো? তুই কি আমাকে টাকার গরম দেখাস?

মনজু!

জি স্যার।

তুমি চালাক ছেলে। তোমার মতোই একজনকে আমার দরকার। করবে এই চাকরি?

স্যার, বেতন কী?

যদি চাকরি কর— তুমি থাকবে আমার ওয়ারির বাড়িতে। খাওয়াদাওয়া ফ্রি। মাসে তোমাকে ছয় হাজার করে টাকা দেয়া হবে। অফিসের অন্যান্য সুবিধা যা আছে পাবে। করতে চাও এই চাকরি?

জি স্যার। অবশ্যই করব।

তুমি আমার সঙ্গে শুরুতে যে চালাকি করেছ সে-রকম চালাকি আমার ছেলের সঙ্গে করবে না। শুভ্র চালাকি ধরতে পারে না।

মনজু বলল, স্যার, মানুষ ভুল একবারই করে।

মোতাহার হোসেন বললেন, মানুষ বার বারই ভুল করে। তুমিও করবে। তবে মনে রেখ— আমার ছেলের সঙ্গে যদি কোনো ভুল কর আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

মনজু বলল, স্যার ভুল হবে না।

মোতাহার হোসেন বললেন, এখন কানে ধর।

মনজু হতভম্ব হয়ে তাকাল। এই শুয়োর কী বলে? আমি কানে ধরব কী জন্যে?

মোতাহার হোসেন বললেন, আমার সঙ্গে যে চালাকি করেছ তার শাস্তি হিসেবে আমি না বলা পর্যন্ত তুমি কানে ধর উঠবোস করতে থাকবে। চাকরি পাবার এটা হলো পূর্বশর্ত।

মনজু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এটা কি কোনো ঠাট্টা? কোনো রসিকতা? মোতাহার হোসেনও তাকিয়ে আছেন। তার চোখের দৃষ্টি শান্ত। শান্ত দৃষ্টি বলে দিচ্ছে মনজুকে ছয় হাজার টাকা বেতনের চাকরি নিতে হলে সত্যি সত্যি তাকে কানে ধরে উঠবোস করতে হবে। এটা কি আসলেই সম্ভব? রাস্তায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে পড়ে থাকলেও সম্ভব না। মনজুর বাবা একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন। গ্রামে তিনি সম্মান নিয়ে বাস করেছেন। বাবার পুরনো ছাত্রের সঙ্গে যখন দেখা হয় তারা আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে, তুমি জালাল সাহেবের ছেলে। তোমার বাবা তো ফেরেশতার মতো মানুষ ছিলেন।

মনজু কানে ধরে উঠবোস করছে। এর মধ্যেই মোতাহার হোসেন অফিসের ম্যানেজারকে ডেকেছেন। ম্যানেজারকে খুবই সহজ ভঙ্গিতে বলেছেন— এই ছেলেটাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দাও। বেতন সব মিলিয়ে ছয় হাজার টাকা। আজ তাকে এক মাসের বেতন অ্যাডভান্স দেবে। মনে হয় টাকা তার খুবই দরকার। মাসে মাসে কেটে রাখবে।

মনজু যাত্রাবাড়িতে ফিরল রাত আটটায়। সে তার মামির জন্যে সবুজ রঙের একটা শাড়ি, ইকবাল সাহেবের জন্যে সিল্কের পাঞ্জাবি কিনে এনেছে। বাজারের বড় ব্যাগে করে দুই কেজি খাসির মাংস, একটা ইলিশ মাছ, পোলাওয়ের চাল

এবং ঘি এনেছে। দই এবং এক কেজি কুমিল্লার মাতৃভাণ্ডারের রসমালাই এনেছে। রাতে যাতে মামার বাসায় আজ ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়।

রুনু সব দেখে অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার ?

মনজু বলল, বড় সাহেব জাপান থেকে ফিরেছেন। আমার ঢাকাতেই পোস্টিং হয়েছে। আমি কাল ভোরবেলা কাজে জয়েন করব।

রুনু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

মনজু তার মামির পা ছুঁয়ে বলল, মা, আপনার জন্যে শাড়িটা এনেছি। আমার নিজের মা আমার তিন বছর বয়সে মারা গেছেন। তাকে কিছু দিতে পারি নি। আপনাকে দিলাম।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মনজুর বাবা নেই, তবে মা বেঁচে আছেন। বিয়ে শাদিও করেছেন।

মনজুর মামি এতই খুশি হলেন যে তার চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন, তুমি কাল সকালে চলে যাবে এইসব কী বলছ ? তুমি আমার এইখানেই থাকবে।

মনজু বলল, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব। কোম্পানি আমাকে থাকার জায়গা দিয়েছে। আমাকে সেইখানেই থাকতে হবে।

বাড়িতে রান্নার বিপুল আয়োজন চলছে। ইকবাল সাহেব গেছেন দোকান থেকে ঠাণ্ডা কোক আনতে। ফিস্টটা যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। নতুন পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে গিয়েছেন। পাঞ্জাবিটা সুন্দর ফিট করেছে।

মনজু বসার ঘরে একা বসে আছে। রুনু এক সময় বসার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল— মনজু ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। রুনু অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ?

মনজু বলল, আমি আজ খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

রুনু বলল, ঘটনাটা বলবেন ?

মনজু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, একজন আমাকে সবার সামনে কানে ধরে উঠবোস করিয়েছে।

রুনু বলল, সেই একজনটা কে ?

মনজু জবাব দিল না। শব্দ করে কাঁদতে লাগল। রুনু গিয়ে তার মাকে ডেকে নিয়ে এলো। তিনি এসে মনজুকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন।

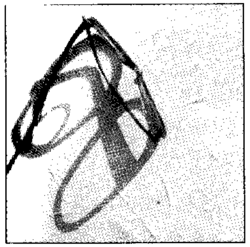

মনজু মায়া লজের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনি যে ছোট সাহেবের মা, এই বাড়ির কর্ত্রী— তা কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়। ভদ্রমহিলার মুখটা ছোট এবং নিখুঁত গোলাকার বলেই মুখে বিড়াল বিড়াল ভাব চলে এসেছে। পরেছেন কালো সিল্কের শাড়ি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা সাদা-কালো বিড়াল বসে ফোঁস ফোঁস করছে। তার সামনে একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার আছে। মনজু খালি চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বসতে বলা হয় নি। তাকে বসতে বলা হবে এমন কোনো সম্ভাবনাও সে দেখছে না। ভদ্রমহিলা তাকে চাকরবাকর হিসেবেই দেখছেন।

তোমার নাম কী বললে ?

মনজু!

মনজু না মজনু ? স্পষ্ট করে বলো। বিড়বিড় করছ কেন ?

ম্যাডাম আমার নাম মনজু।

জাহানারা টেবিলে রাখা চশমা চোখে দিলেন। পরীক্ষকের ভঙ্গিতে তাকালেন। তাকে দেখে মনে হলো না মনজুকে তার পছন্দ হয়েছে।

দেশের বাড়ি কোথায় ?

নেত্রকোনা।

জাহানারা হতাশ গলায় বললেন, বুঝেছি— আইছুন খাইছুনের দেশ। শোন ছেলে, শুভ্র'র সঙ্গে এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করবে না। পরে দেখা যাবে সেও আইছুন খাইছুন শুরু করেছে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে, বুঝেছ ?

জি আচ্ছা ম্যাডাম।

আজ আমার শরীরটা খারাপ বলে তোমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার জায়গা হচ্ছে একতলা। সেখানেই থাকবে, উপরে আসবে না। শুভ্র'র ঘরে তোমার যাবার দরকার নেই। বুঝেছ ?

জি।

তুমি সবসময় একটা হ্যান্ডব্যাগ ক্যারি করবে। সেখানে শুভ্র'র জন্যে বাড়তি চশমা রাখবে। শুভ্র'র চোখ খারাপ জানো তো ?

জি জানি।

শেভ কর নি কেন ? প্রতিদিন সকালে শেভ করবে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ঘুরবে না।

জি আচ্ছা।

বয়স কত ?

চব্বিশ।

চব্বিশ বলে তো মনে হয় না। আমার কাছে সাতাশ আঠাশ মনে হচ্ছে। বয়স কমাও কেন ? বয়স কমাবার কী আছে ? শুভ্র'র বয়স চব্বিশ, তাকে দেখে আঠার উনিশের বেশি মনে হয় না। যাই হোক, শুভ্রকে তুমি ভাইজান ডাকবে। আপনি আপনি করে কথা বলবে। মাথার মধ্যে রাখবে যে তুমি তার ইয়ার বন্ধু না।

জি আচ্ছা।

একটা মোটা খাতা কিনবে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে শুভ্র সারাদিন কী করল না-করল গুছিয়ে লিখে রাখবে। আমি যে-কোনোদিন দেখতে চাইব। কি বলছি মনে থাকবে ?

জি।

শুভ্র'র সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

জি-না।

যাও দেখা করে আস। হ্যান্ডব্যাগ আর খাতা কেনার টাকা রহমতুল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে নিও। রহমতুল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে না ? কেয়ারটেকার।

মনজু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে নাড়তে মনে মনে বলল, তুই যে শুধু দেখতেই বিড়ালের মতো তা-না। তুই বিড়ালের মতো মিউমিউ করে কথা বলিস। তোর উচিত ছিল মানুষ বিয়ে না করে একটা হুলো বিড়াল বিয়ে করা। এখনো সময় আছে। দেশের বাড়ি থেকে তোর জন্যে একটা বিড়াল আনব ?

জাহানারা বললেন, ঠিক আছে এখন যাও। বারান্দা ধরে সোজা হাঁট, শেষ মাথায় শুভ্র'র ঘর। শুভ্রকে তোমার কথা বলা আছে। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি— গাড়িতে করে যখন যাবে তুমি সবসময় বসবে ড্রাইভারের পাশের সিটে। শুভ্র'র সঙ্গে বসবে না। ড্রাইভার কত স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে লক্ষ রাখবে। স্পিড কখনো যেন চল্লিশ কিলোমিটারের বেশি না হয়। ড্রাইভার যেন কখনো কোনো গাড়ি ওভারটেক না করে। আচ্ছা তুমি এখন যাও।

মনজু শুভ্র'র ঘরের দিকে রওনা হয়েছে। পেছনে না ফিরেও সে বুঝতে পারছে বিড়ালনি তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে 'শুভ্র' নামক জিনিসটার ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত তাকিয়েই থাকবে। মনজু ঘর থেকে যখন বের হবে তখনো দেখবে বিড়ালনি তার জায়গায় বসে আছে। তাকে দেখতে পেয়েই হাত ইশারায় ডাকবে। সে যখন বিড়ালনির কাছে এসে দাঁড়াবে তখন বলবে, এই ছেলে তোমার নাম যেন কী ? নামটা ভুলে গেছি। (বিড়ালনির নাম ঠিকই মনে আছে। তারপরেও নাম ভুলে গেছি বলবে তাকে তুচ্ছ করার জন্যে।) কঠিন কোনো গালি এই মহিলাকে দিতে পারলে মন শান্তি হতো।

'শুভ্র' নামক জিনিসটার ঘরে ঢুকবে এই নিয়ে টেনশান হচ্ছে। বিড়ালনি যেমন সারাক্ষণ তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন শুভ্র ছাগলটাও তাই করবে। ছাগলটাকে শুরুতে সে কী বলবে— 'স্যার, আমি এসেছি।' না, 'স্যার' বলা যাবে না— বলতে হবে 'ভাইজান'। চাকর-বাকরের মুখে ভাইজান মানায়। অন্য কিছু মানায় না। সে যদি ঘরে ঢুকে ছাগলটার পা ছুঁয়ে সালাম করে বলতে পারত— 'ভাইজান গো! আমি আইছি। অখন কী করমু কন। শইল্যে তেল মালিশ কইরা দেই ?' হবে না। গেরাইম্যা ভাষা বলা যাবে না। শান্তি নিকেতনের গুরুদেবের ভাষা বলতে হবে— 'ভাইজান, আমি এসেচি। (এসেছি চলবে না— ছ বাতিল, শুধুই চ) আমি আপনার সেবক। আপনার সোনার অঙ্গে তেল ডলে দেব খন।'

শুভ্র'র হাতে ফুটখানিক লম্বা একটা দড়ি। সে দড়ি দিয়ে গিট্টুর মতো কী একটা বানিয়ে গভীর মনোযোগে গিট্টুর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন এটা কোনো গিট্টু না, মহৎ কোনো শিল্পকর্ম। মনজু দরজার ওপাশ থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বিড়ালনির গর্ভে এ কী জিনিস ? এমন সুন্দর কোনো পুরুষ মানুষ তো সে আগে কখনো দেখে নি। শুধু যে দেখতেই সুন্দর তা-না। চেহারার মধ্যে মায়া মায়া ভাব। যেন অসম্ভব রূপবান একজন যুবক বালক বালক চেহারা নিয়ে বসে আছে।

মনজু বলল, ভাইজান, আমি আসব ?

শুভ্র গিট্টু থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, এসো। মা তোমার কথা আমাকে বলেছেন। তুমি মনজু। চট করে বাথরুমে ঢুকে বাথরুমের বেসিন থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এসো। তোমাকে খুবই মজার একটা জিনিস দেখাব।

মনজু বাথরুম থেকে কাঁচি নিয়ে এলো। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, শুভ্র নামের জিনিসটা তার সঙ্গে অতি পরিচিতজনের মতো কথা বলছে। বিড়ালনি অতি ভদ্র একটা ছেলে পয়দা করেছে।

কাঁচি এনেছ ?

জি।

এখন খুব সাবধানে গিট্টুটা কাট।

মনজু গিট্টু কাটল। শুভ্র বলল, আমি তোমাকে এখন খুবই বিস্ময়কর একটা ব্যাপার দেখাব। কাটা দড়িটা তোমার চোখের সামনে জোড়া লাগিয়ে দেব।

মনজু তাকিয়ে আছে। কাটা দড়ি কীভাবে জোড়া লাগবে সে বুঝতে পারছে না। দড়িটা যে দু' টুকরা হয়েছে এটা বুঝা যাচ্ছে। দড়ির চারটা মাথা বের হয়ে আছে।

মনজু!

জি ভাইজান।

শুভ্র বলল, দেখ আমি কী করছি— দু'টা দড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলাম। হাতের মুঠো খুলব, দেখবে দড়ি জোড়া লেগে গেছে। আমাকে কিছুক্ষণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকতে হবে। কারণ কাটা দড়ি জোড়া লাগানোর সময় দিতে হবে। এক কাজ করা যাক— তুমি বরং হাত মুঠো কর, তোমার হাতে দিয়ে দেই। কাটা দড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাক। আমি না বলা পর্যন্ত হাতের মুঠো খুলবে না। ভালো কথা— তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বসো। সামনের চেয়ারটায় বসো।

মনজু বসল। তার হাতের মুঠোয় কাটা দড়ি। শুভ্র হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। কিশোরের সহজ-সরল হাসি। নেত্রকোনার ভাষায় এই হাসির নাম— অন্তরি হাসি। অন্তর থেকে যে হাসি আসে সেই হাসি।

মনজু!

জি ভাইজান।

শুভ্র মনজুর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, তুমি যদি শুভ্র হতে আর তোমার বাবা যদি তোমার জন্যে একজন অ্যাসিসটেন্ট ভাড়া করে নিয়ে আসত, যে অ্যাসিসটেন্টের কাজ হচ্ছে তোমাকে পাহারা দেয়া— তুমি রাগ করতে না ?

করতাম।

আমিও রাগ করেছি। খুবই রাগ করেছি। আমি অথর্ব কেউ না। আমার বুদ্ধিবৃত্তিও নিম্ন পর্যায়ের তা না। আমার সঙ্গে একজন চড়নদার কেন লাগবে ? বাবা তোমাকে চড়নদারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। মা কী করবেন জানো ? মা চেষ্টা করবেন গোপনে তোমাকে স্পাই বানিয়ে ফেলতে। তোমার কাজ হবে আমি কোথায় যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি, কী কথা বলছি সব মা'কে জানানো। আমার ধারণা ইতিমধ্যেই এই দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে। হয় নি ?

উনি বলেছেন প্রতিদিন রাতে ঘুমাবার সময় আপনি কোথায় যান, কী করেন সব একটা খাতায় লিখে রাখতে।

বাহ্ ভালো তো। Written report. মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি ঘর থেকেই বের হই না। দিনের পর দিন এই ঘরে বসে থাকি। বই পড়ি। কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করি। ইন্টারনেটে অপরিচিত সব মানুষদের সঙ্গে গল্প করি।

মনজু বলল, ভাইজান, দড়ি কি জোড়া লেগেছে ?

না, এখনো লাগে নি। হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাক। যখন লাগবে আমি বলব। মনজু শোন, তুমি যে আমার প্রথম চড়নদার তা কিন্তু না। তোমার আগে আরো চারজন ছিল। ওদের প্রত্যেককেই আমার পছন্দ হয়েছিল। কেউ বেশিদিন থাকে না। বড়জোর তিন মাস, তারপরই এদের চাকরি চলে যায়। কী জন্যে চলে যায় আমি নিজেও জানি না। তোমার ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটবে। কাজেই তোমার উচিত হবে গোপনে চাকরি খোঁজা।

মনজু হঠাৎ আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

শুভ্র বলল, আমাকে পছন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি খুবই ভালোমানুষ। মন্দ হবার জন্যে মন্দ মানুষদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে হয়। আমি তা করি না। আচ্ছা তুমি এখন যাও।

হাতের মুঠা খুলব ভাইজান ?

নিজের ঘরে গিয়ে খোল।

মনজু শুভ্র'র ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েই থমকে গেল। জাহানারা ঠিকই আগের জায়গায় বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তবে তিনি তাকে ডাকলেন না। মনজু নিজের ঘরে ঢুকে হাতের মুঠা খুলল— সত্যি সত্যি দড়ি জোড়া লেগেছে। মনজু বুঝতে পারছে দড়ি জোড়া লাগার ঘটনা ঘটেছে অনেক আগেই, যখন তার হাতে দড়ি দেয়া হয়েছে তখনই। শুভ্র নামের মানুষটা এতক্ষণ শুধু শুধু তাকে মুঠো বন্ধ করে রেখেছে। সে তার সঙ্গে মজার একটা খেলা খেলেছে।

মনজুকে যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে সেই ঘরটা বেশ বড়। দু'টা সিঙ্গেল খাট পাতা আছে। একটাতে সে বিছানা করেছে, অন্যটা খালি। ঘরে দু'টা চেয়ার আছে, একটা টেবিল আছে। বেশ বড় একটা ওয়ারড্রোব আছে। আলনা আছে। কালো রঙের বিশাল একটা ট্রাংক আছে। ট্রাংক তালাবন্ধ। ছোট্ট পিচকা তালা, চাপ দিলেই খুলে যাবে। ট্রাংকটার দিকে তাকালেই মনজুর ইচ্ছা করে তালা ভেঙে দেখতে ভেতরে কী আছে।

এই বাড়ির দোতলটা যেমন ফাঁকা একতলা ফাঁকা না। অনেক লোকজন বাস করে। মনজুর পাশের ঘরেই থাকেন রহমতুল্লাহ। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের মতো। তিনি এ বাড়ির ম্যানেজার। শক্ত সমর্থ চেহারা। সারাদিনই ছোটাছুটির মধ্যে আছেন। তার প্রধান ডিউটি প্রতিদিন সকালে বাজার করা। তার একজন অ্যাসিসটেন্ট আছে, ছগীর নাম। তার ডিউটি কী বোঝা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় সে বারান্দার বেঞ্চিতে কুঁজো হয়ে বসে আছে। এই সময় যেই বারান্দায় থাকে ছগীর সরু চোখে তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। প্রথমবার এই দৃশ্য দেখে শঙ্কিত হয়ে মনজু জিজ্ঞেস করেছিল— কিছু বলবেন ? ছগীর না-সূচক মাথা নেড়েছে কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় নি।

ড্রাইভার আছে তিনজন, দারোয়ান চারজন। তারা পাশাপাশি ঘরে থাকে এবং সারাক্ষণই ক্যারাম খেলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্যারামের ঘুটির খটাস খটাস শব্দ হতে থাকে। সন্ধ্যার পর থেকে তাদের ঘরে টিভি চালু হয়। তখন শুরু হয় তাস খেলা। তাস খেলা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। একদিকে তাস খেলা চলছে অন্যদিকে চলছে টিভি। মনজুর মনে হয় এরাই এ বাড়ির সবচে' সুখী মানুষ।

রান্না করা এবং কোটাবাছার লোক সব মিলিয়ে কয়জন মনজু এখনো জানে না। তারা থাকে একতলার ভেতরের দিকে। খানিকটা খোলা বারান্দা পার হয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। তবে ভেতরের বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। রহমতুল্লাহ প্রথম দিনেই নিয়মকানুন বলে দিয়েছেন। গলাখাঁকারি দিয়ে বলেছেন (তিনি প্রতিটি বাক্য গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করেন)— মনজু শোন, ভিতরের বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। মেয়েছেলেরা কাজ করে। কাজের সময় তাদের কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না, বুঝেছ ? মাথা নাড়লে হবে না। মুখে বলো— বুঝেছি।

মনজু বলল, বুঝেছি।

তিনবেলা খাওয়া তোমার ঘরের সামনে টিফিন ক্যারিয়ারে দিয়ে যাবে। খাওয়ার পরে টিফিন ক্যারিয়ার ধোয়ামোছা করে ঘরের সামনে রেখে দিতে হবে। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, কার কখন ডিউটি তার নাই ঠিক। বুঝেছ ?

জি বুঝেছি।

ধর সকালে টিফিন ক্যারিয়ারে তোমারে নাশতা দেয়া হলো। তুমি নাশতা খেলে না। নাশতা ভরা টিফিন ক্যারিয়ার তোমার ঘরের সামনে পড়ে রইল। তখন কিন্তু তোমাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হবে না। নাশতা যদি নাও খাও— টিফিন ক্যারিয়ার ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। বুঝেছ ?

জি বুঝেছি।

মাসে একদিন প্রথম বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় ফিস্ট হয়। সেদিন আমরা চেষ্টা করি সবাই মিলে একত্রে খাওয়াদাওয়া করতে। পোলাও রোস্ট, খাসির মাংসের কালিয়া আর দৈ মিষ্টি। যেদিন দৈ মিষ্টি থাকে না সেদিন থাকে কোক ফান্টা। তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস করার আছে ?

জি-না।

বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান আছে। বাগানে ঘুরতে চাইলে ঘুরতে পার, শুধু রাত বারটার পরে না। রাত বারটার পরে কুত্তা ছেড়ে দেয়া হয়। স্যারের দু'টা কুত্তা আছে— সরাইলের কুত্তা। ভয়ঙ্কর। কুত্তার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করানো হয়েছে ?

জি-না।

যাও গার্ডের কাছে যাও, সে পরিচয় করায়ে দেবে। তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকাবে। কুকুরের স্মৃতিশক্তি ভালো। একবার কারোর গায়ের গন্ধ শুঁকলে বাকি জীবন মনে রাখে। তারপরেও প্রথম এক সপ্তাহ রোজ তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকায়ে আসবে। এদের নামও মনে রাখবে। একজনের নাম টুং, আরেকজনের নাম টাং।

কুকুরের নাম টুং টাং ?

ছোট সাহেব নাম রেখেছেন। কুকুর দু'টাই নিজেদের নাম খুব ভালো মতো চেনে। টুং ডাকলে টুং ছুটে আসে, টাং ডাকলে টাং ছুটে আসে। তোমার কি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে ?

জি-না।

আমাদের এইখানের নিয়মে মাসে দুই দিন ছুটি। ছুটি কবে নিতে হবে সেটা আগেই বলে দিতে হবে। ইচ্ছা করলে ছুটি জমাতে পার। কোনো মাসে যদি ছুটি না নাও তাহলে পরের মাসে চারদিন ছুটি পাবে। এই বাড়িতে চাকরির আরাম আছে। ভালো আরাম।

মনজু বলল, আপনাকে কী ডাকব ?

রহমুতুল্লাহ বললেন, যা ইচ্ছা হয় ডাকবে, শুধু স্যার ডাকবে না। আমরা এখানে শুধু বড় সাহেবকে স্যার ডাকি।

চাচাজি ডাকব ?

ডাকতে পার। ও আচ্ছা, আরেকটা কথা তো বলতে ভুলে গেছি। মাসে এক দুই দিন আমার শরাব খাওয়ার অভ্যাস আছে। সবাই জানে। বড় স্যারও জানেন। মাতাল অবস্থায় একদিন উনার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। উনি কিছু বলেন নাই। যাই হোক আসল কথা হচ্ছে— ফিস্টের রাতে একতলার লোকজন চান্দা তুলে

আমাকে একটা বোতল কিনে দেয়। বোতল কেনার চান্দা তুমিও দিবে। তোমার ভাগে ত্রিশ চল্লিশ টাকার বেশি পড়বে না।

মনজু বলল, জি আচ্ছা।

তোমার কি এইসব অভ্যাস আছে?

জি-না।

না থাকাই ভালো। অতি বদঅভ্যাস। আমি হজ্ব করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হজ্বের পর তওবা করে এইসব ছেড়ে দেব।

জাহানারা ছেলের ঘরে এসে বসেছেন। শুভ্র হাসিমুখে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে, তবে সে মাকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তার চোখে চশমা নেই। সে দেখছে নাক-মুখবিহীন ফর্সা একটা গোলাকার মুখ। শুভ্র বলল, মা, তুমি কেমন আছ?

জাহানারা বললেন, আমি কেমন আছি তা দিয়ে তো তোর কোনো দরকার নেই। আমাকে ছাড়াই তো তুই সুখে আছিস। আমি একবার পনেরো ঘণ্টা তোর সঙ্গে কথা বলি নি। তুই বুঝতেই পারিস নি।

শুভ্র বলল, বুঝতে পারব না কেন। ঠিকই বুঝেছি। আমি ভাবলাম কোনো কারণে তুমি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছ না। একা একা থাকতে চাচ্ছ। তাই তোমাকে বিরক্ত করি নি।

ছেলেটাকে কেমন দেখলি?

কোন ছেলেটা?

ঐ যে তোর সঙ্গে সঙ্গে যে ঘুরবে। তোর টেক কেয়ার করবে। মিজান না কী যেন নাম।

ও, মনজুর কথা বলছ? ভালো ছেলে। বুদ্ধিমান, সরল সোজা।

তোর কাছে তো সবাই বুদ্ধিমান। সবাই সরল সোজা। ও তোর কাছ থেকে হাতে মুঠো করে কী নিয়ে যাচ্ছিল?

দড়ি নিয়ে যাচ্ছিল।

জাহানারা অবাক হয়ে বললেন, দড়ি নিয়ে যাচ্ছিল মানে কী?

মানে হলো মা, আমি ওকে একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছিলাম। চায়নিজ রোপ ট্রিক। একটা দড়ি কেটে দু' টুকরা করে তার হাতে দিয়েছি। দশ মিনিট মুঠো বন্ধ করে রাখলে কাটা দড়ি জোড়া লেগে যায়। এই ট্রিক।

জোড়া লেগেছে?

জানি না জোড়া লেগেছে কি-না। তার সঙ্গে পরে আমার আর দেখা হয় নি।

তুই দুনিয়ার সবাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস, কই আমাকে তো এখনো দেখালি না।

এইসব ব্যাপারে তোমার আগ্রহ নেই, সেই জন্যে তোমাকে দেখাই নি।

আগ্রহ নেই তোকে কে বলল? ছোটবেলায় কত ম্যাজিক দেখেছি। আমি নিজেও একটা ম্যাজিক পারতাম— রাবারব্যান্ড দিয়ে করতে হয়। এখন অবশ্যি ভুলে গেছি। দেখি তুই আমাকে একটা ম্যাজিক দেখা। ঐ ছোড়াটাকে যেটা দেখিয়েছিস সেটা না। অন্য কিছু।

অন্য কিছু তো মা পারব না। আমি একটাই ভালোমতো শিখেছি। কাটা দড়ি জোড়া লাগানো। এটা দেখাব?

আচ্ছা দেখা।

তাহলে মা তুমি চট করে বাথরুমে যাও। কাঁচিটা নিয়ে আস।

জাহানারা ছেলের বাথরুমে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাথরুমের আয়নায় বড় বড় করে একটা ইংরেজি কবিতা লেখা। কবিতাটা লেখা হয়েছে লাল লিপস্টিক দিয়ে। শুভ্র লিপস্টিক পাবে কোথায়? তিনি কয়েকবার কবিতাটা পড়লেন। যে লিপস্টিক দিয়ে কবিতাটা লেখা হয়েছে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। লিপস্টিক পাওয়া গেল না।

বাথরুমের আয়নায় লেখা—

I often see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are.
Heaven gives its glimpses only to those
Not in position to look too close.

জাহানারা কাঁচি হাতে ছেলের সামনে বসলেন। ম্যাজিকে এখন তার মন নেই। তার মাথায় ঘুরছে বাথরুমের আয়নায় লেখা কবিতা। যে লিপস্টিক দিয়ে কবিতাটা লেখা হয়েছে সেই লিপস্টিক।

জাহানারা বললেন, বাথরুমের আয়নায় হাবিজাবি এইসব কী লিখেছিস?

শুভ্র বলল, রবার্ট ফ্রস্টের একটা কবিতার প্রথম দু' লাইন এবং শেষ দু' লাইন।

মানে কী?

শুভ্র বলল, মানে হচ্ছে যে মানুষ গভীর আগ্রহে কিছু দেখতে চায় প্রকৃতি তাকে দেখায়, তবে খুব সামান্যই দেখায়।

জাহানারা বললেন, কিছুই তো বুঝলাম না। আচ্ছা বাদ দে। আমার কবিতা বোঝার দরকার নেই। তুই কী দেখাবি দেখা।

শুভ্র বলল, এই দেখ মা, দেড় ফুট লম্বা একটা দড়ি। তুমি মাঝখান দিয়ে কেটে দাও। এখন বলো— দু'টুকরা হয়েছে না ? এখন এই দু'টা টুকরা হাতের মুঠোয় নিয়ে নিজের ঘরে যাও। ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে মুঠো খুলবে। দেখবে দড়ি জোড়া লেগে গেছে।

সেটা কী করে সম্ভব ?

ম্যাজিক মানেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করা।

জাহানারা মুঠোয় করে দড়ি নিয়ে এলেন। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে মুঠো খুললেন। দড়ি জোড়া লাগে নি। যেমন ছিল তেমনি আছে।

শুভ্র কি তার সঙ্গে ফাজলামি করেছে ? ম্যাজিকই তাকে দেখায় নি ? দড়ি কেটে তার হাতে দিয়ে দিয়েছে ? হয়তো সে এই ম্যাজিক জানে না। মজা করেছে। মিজান না ফিজান নামের ছেলেটার সঙ্গেও হয়তো তাই করেছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না। চাকরবাকর শ্রেণীর মানুষদের লাই দিতে নাই। লাই দিলেই এরা চেষ্টা করে কোলে বসে পড়তে।

জাহানারা সকিনাকে ডেকে পাঠালেন। ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো যদি শুভ্র'র বর্তমান খেলা হয় তাহলে সে সকিনাকেও ম্যাজিক দেখিয়েছে। সেও নিশ্চয়ই কাটা দড়ি হাতে নিয়ে পাঁচ মিনিট ঘরে বসে ছিল। তারপর দেখল দড়ি যেমন কাটা ছিল সে-রকম কাটাই আছে। 'এপ্রিল ফুল' হয়েছে।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র কি তোমাকে কোনো ম্যাজিক দেখিয়েছে ?

জি।

দড়ি কাটার ম্যাজিক ?

জি। উনি আমার সামনে একটা দড়ি কেটে দু'ভাগ করলেন। আমাকে বললেন মুঠি বন্ধ করে পাঁচ মিনিট রাখতে। আমি রাখলাম। তারপর দড়ি জোড়া লেগে গেল। মা, আমি যে কী অবাক হয়েছি।

জাহানারা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি যখন-তখন তার ঘরে যাও কেন ?

সকিনা ভীত গলায় বলল, আমি তো যখন-তখন যাই না। ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে সকালে একবার যাই, বিকালে একবার যাই।

আর যাবে না।

জি আচ্ছা।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, অল্পবয়েসী মেয়ের শরীরের গন্ধ খুব খারাপ। এই গন্ধে মহাপুরুষরাও অন্যরকম হয়ে যান। তুমি যখন-তখন ঝাড়ু দেবার নাম করে আমার ছেলের ঘরে ঢুকবে, শরীরের গন্ধ ছড়াবে। ঝাড়ু দেবার জন্যে কায়দা করে মাথা নিচু করবে যাতে বুক দেখা যায়। এতে যদি আমার ছেলের কোনো সমস্যা হয় তখন ? পেট বাঁধালে তোমাদের কিছু যায় আসে না। তোমাদের পেট বাঁধিয়ে অভ্যাস আছে। আজকে পেট বাঁধাবে, কাল ফেলে দেবে। কাঁদছ কী জন্যে ? এইসব মরাকান্না আমার সামনে কাঁদবে না। যাও সামনে থেকে।

সকিনা প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বের হলো। জাহানারা নিজেই তার ঘরের পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হবে। তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার।

তারও আগে জানা দরকার শুভ্র লিপস্টিক কোত্থেকে পেয়েছে। সকিনার কাছ থেকে নিয়েছে ? কটকটা লালরঙের লিপস্টিক চাকরানী টাইপ মেয়েদের কাছেই থাকে। মেয়েটাকে যখন শুভ্র ম্যাজিক দেখাচ্ছিল তখনই হয়তো শুভ্র বলেছে— তোমার কাছে লাল লিপস্টিক আছে ? নিয়ে এসো। তাতেই সকিনা মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে লিপস্টিক আনতে গেছে। হারামজাদী ভেবেছে— ভাইজানের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। লিপস্টিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুভ্র'কে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে হবে। সন্দেহ নিয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

শুভ্র'র ঘরের সব বাতি নেভানো। তবে সে জেগে আছে। কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। কম্পিউটারের পর্দার হালকা সবুজ আলো পড়েছে তার চোখেমুখে। কী সুন্দর লাগছে। জাহানারা জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভ্র গভীর মনোযোগ কী যেন টাইপ করছে। জাহানারার ছেলের মনোযোগ নষ্ট করার ইচ্ছা করল না।

শুভ্র ইন্টারনেটে একজনের সঙ্গে শব্দহীন কথা বলাবলি করছে। সেই একজনের নাম 'আত্রলিতা'। শুভ্র'র ধারণা নামটা আসল না। ছদ্মনাম। ইন্টারনেটে গল্পগুজবের সময় বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই ছদ্মনাম ব্যবহার করে।

আত্রলিতার বাড়ি নরওয়েতে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকলজির ছাত্রী। বয়স উনিশ। শুভ্র'র সঙ্গে সে মাঝে মধ্যেই গল্প করে।

শুভ্র কম্পিউটার কী-বোর্ডে দ্রুত লিখল— কেমন আছ আত্রলিতা ?

আত্রলিতা জবাব দিল— ভালো না।

ভালো না কেন ?

আমার মন ভালো নেই।

মন ভালো নেই কেন ?

আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।

বকা দিয়েছে ?

না, বকা দেয় নি। হাসি হাসি মুখে বলেছে— তোমার সঙ্গে আমার মিশ খাচ্ছে না। তুমি দক্ষিণ মেরুর মেয়ে আর আমি উত্তর মেরুর ছেলে। দুই মেরুর দু'জন একসঙ্গে কনসার্টে বাজনা বাজাতে পারে না।

তোমার বয়ফ্রেন্ড তো খুব গুছিয়ে কথা বলে!

সে মোটেই গুছিয়ে কথা বলে না। তার কিছু মুখস্ত কথা আছে। আমাকে সে যে কথাগুলি বলেছে এরকম কথা সে আগেও তার অন্য বান্ধবীদের বলেছে।

তাহলে তো এমন একজনের সঙ্গে কনসার্টে বাজনা বাজানোই উচিত না। তুমি বরং একাই বাজনা বাজাও।

একা একা কি কনসার্ট হয় ?

হ্যাঁ হয়। একটা বাজনা তুমি সত্যি সত্যি বাজাবে। অন্য বাজনাগুলি কল্পনা করে নেবে।

শুভ্র, তুমি কিন্তু খুব গুছিয়ে কথা বলো। তুমি কেমন আছ ?

ভালো আছি।

তোমার চোখের অবস্থা কী ?

এখনো দেখতে পাচ্ছি।

আজ সারাদিনে সবচে' সুন্দর দৃশ্য কী দেখেছ ?

আজ সারাদিনের সবচে' সুন্দর দৃশ্যটি এখন দেখছি।

এখন কীভাবে দেখবে ? এখন তো তুমি কম্পিউটারের স্ক্রিনের সামনে বসে আছ।

আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে আমার মায়ের ছায়া পড়েছে। উনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তিনি এই কাজটা করেন— জানালার পাশে এসে দাঁড়ান। আমি কী করছি আড়াল থেকে দেখেন।

বাহ্ ভালো তো! তুমি একটা কাজ কর। কম্পিউটার অফ করে তোমার মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প কর।

ঠিক আছে, তাই করব। আচ্ছা আত্রলিতা, এটা কি তোমার সত্যি নাম ?

অবশ্যই সত্যি নাম। আমি মিথ্যা বলি না।

মিথ্যা বলো না কেন ?

প্রয়োজন হয় না বলে বলি না।

প্রয়োজন হলে কি বলতে ?

না।

আত্রলিতা! বিদায়।

বিদায়।

শুভ্র কম্পিউটার বন্ধ করে চেয়ার ঘুরিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন আছ মা ?

জাহানারা হকচকিয়ে গেলেন। শুভ্র বলল, কী দেখছিলে ?

জাহানারা বললেন, তোকে দেখছিলাম। এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকিস কেন ?

এখন ঘুমিয়ে পড়ব। ভেতরে এসো মা। গল্প করি।

গল্প করতে হবে না। ঘুমুতে যা। আচ্ছা শুভ্র, তুই আয়নায় যে কবিতাটা লিখেছিস সেটা যেন কার লেখা ?

রবার্ট ফ্রস্টের।

যে লিপস্টিক দিয়ে কবিতাটা লিখেছিস সেটা কোথায় ?

শুভ্র বলল, লিপস্টিক দিয়ে লিখি নি তো মা! ক্রেয়ন দিয়ে লিখেছি। কেন বলো তো ?

আমাকে দিস তো! আমিও মাঝে মাঝে আয়নায় লিখব।

এসো, নিয়ে যাও।

জাহানারা চাররঙের চারটা ক্রেয়ন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরলেন। সবুজ রঙ দিয়ে আয়নায় লিখলেন— শুভ্র, তুই এত ভালো কেন ?

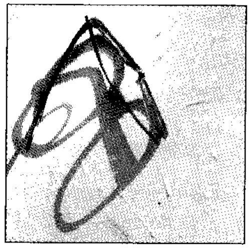

সারাদিন আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না। সন্ধ্যায় আকাশ কালো করে মেঘ করল। বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল রাত আটটা থেকে। একেকবার বাতাসের ঝাপ্টা আসে, বাগানের লোহার দোলনা দুলে উঠে কটকট শব্দ হয়। শহরের বাড়ি-ঘরে বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায় না। মায়া লজে পাওয়া যায়। টিনের চালে বৃষ্টির যে শব্দ ওঠে, কোনো এক অদ্ভুত কারণে এ বাড়িতেও ওঠে।

মোতাহার হোসেন শুভ্র'র ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের সবক'টা জানালা খোলা। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকছে। শুভ্র বসে আছে কম্পিউটারের সামনে। তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো যোগ আছে। বাইরের ঝড়-বৃষ্টির খবরই হয়তো সে জানে না। মোতাহার হোসেন খুশি খুশি গলায় বললেন, Hello young man!

শুভ্র কম্পিউটার থেকে চোখ ফেরাল বাবার দিকে। তার মুখও হাসি হাসি। সে মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, Hello old man and the sea!

মোতাহার হোসেন বললেন, সিরিয়াস বৃষ্টি-বাদলার দিনে তুই কম্পিউটারের সামনে বসে আছিস কেন ?

শুভ্র বলল, বৃষ্টি-বাদলার দিনে আমার কী করা উচিত ?

বৃষ্টিতে ভিজবি ? আয় বৃষ্টিতে ভিজি। আগে কম্পিউটার অফ কর। বৃষ্টির সঙ্গে কম্পিউটার যায় না।

শুভ্র কম্পিউটার অফ করতে করতে বলল, বাবা, ভেতরে এসো। গল্প করি।

মোতাহার হোসেন ঘরে ঢুকলেন। ছেলের মুখোমুখি না বসে তার পাশে বসলেন। পাশাপাশি বসলে মাঝে-মধ্যে ছেলের গায়ে হাত রেখে কথা বলা যায়। মুখোমুখি বসলে সেটা সম্ভব হয় না।

শুভ্র!

জি বাবা।

প্রবল বৃষ্টিকে ইংরেজিতে বলে Raining cats and dogs. কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক কী তুই জানিস ?

শুভ্র বলল, কুকুর এবং বিড়াল— এরা হলো একজন আরেকজনের শত্রু। এরা যখন ঝগড়া শুরু করে, তখন একজন অন্যজনের উপর প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই জন্যেই প্রবল বেগের বৃষ্টি হলো ক্যাটস অ্যান্ড ডগস।

মোতাহার হোসেন মুগ্ধ গলায় বললেন, এমন কোনো বিষয় কি আছে যা তোর জানা নেই ?

শুভ্র বলল, তুমি এত মুগ্ধ হয়ো না বাবা। Cats and Dogs-এর যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছি সেটা বানিয়ে দিয়েছি। আমি আসল ব্যাখ্যা জানি না।

তুই জানিস না ?

না।

ব্যাখ্যাটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। আমার পছন্দ হয়েছে। তোর মা যে তোর উপর ভয়ঙ্কর রেগে আছে— এটা কি তুই জানিস ? তুই না-কি ম্যাজিকের কথা বলে একটা দড়ি কেটে তার হাতে দিয়ে দিয়েছিস ? দড়ি যে-রকম ছিল সে-রকম আছে। সে খুবই অপমানিত বোধ করছে। হা-হা-হা।

মা'র অপমান হয়েছে— তুমি তাতে এত খুশি কেন ?

তাকে বোকা বানানো গেছে— এতেই মনে হয় আমি খুশি।

শুভ্র বলল, মা'কে বোকা বানানোর তো কিছু নেই। বেচারি তো বোকাই।

মোতাহার হোসেন আগ্রহ নিয়ে বললেন, তোর মা বোকা ?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ।

বুদ্ধির স্কেল যদি এক থেকে দশ হয়, তুই তোর মা'কে কত দিবি ?

তিন দেব।

আর আমাকে ?

তোমাকে নয় দেব।

নয় কেন ? দশ না কেন ?

শুভ্র বলল, নিজের বুদ্ধি নিয়ে তোমার অহঙ্কার আছে, এই জন্যেই এক পয়েন্ট কাটলাম। যাদের বুদ্ধি দশে দশ— তারা তাদের বুদ্ধি নিয়ে অহঙ্কার করবে না। অস্বস্তি বোধ করবে।

অস্বস্তি বোধ করবে কেন ?

বুদ্ধি বেশি কেন— এই নিয়ে অস্বস্তি।

তোর বুদ্ধি কি দশে দশ ?

হ্যাঁ।

তোর কথার মধ্যেও তো অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে।

তুমি জিজ্ঞেস করেছ বলেই অহঙ্কারের কথাটা বলেছি। জিজ্ঞেস না করলে বলতাম না।

তোর বুদ্ধি যে দশে দশ— তার কিছু প্রমাণ দে।

শুভ্র বলল, যে আমাকে যে-রকম দেখতে চায়, আমি তার কাছে সে-রকম থাকি। মা আমাকে একটা অসহায় ছেলে হিসেবে দেখতে চায়, যে ছেলে নিজের কোনো কাজই গুছিয়ে করতে পারে না। দাঁত ব্রাশ করে টুথপেস্টের মুখ লাগাতে ভুলে যায়। বাইরে বের হবার সময় চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়। রোজ শেভ করার কথা ভুলে যায়। মা'কে খুশি করার জন্যে এই কাজগুলি আমি ইচ্ছা করে করি। আর তুমি আমাকে একজন সুপার ইন্টেলিজেন্ট ছেলে হিসেবে দেখতে চাও। এখন তুমিই বলো, তোমার কাছে কি আমি সুপার ইন্টেলিজেন্ট ছেলে হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করি নি ?

তুই বলতে চাচ্ছিস যে, তুই আসলে ইন্টেলিজেন্ট না, অথচ ভান করছিস ইন্টেলিজেন্ট। ইন্টেলিজেন্স কি ভান করা যায় ?

একেবারেই যে করা যায় না তা-না। স্যার আলেক গিনিসের মতো বড় অভিনেতারা বোকার অভিনয় যেমন করতে পারেন, বুদ্ধিমানের অভিনয়ও পারেন। পারেন না ?

সেই ক্ষেত্রে তোকে আমি অভিনয়ে দশে দশ দিতে পারি। বুদ্ধিতে কেন দেব ?

শুভ্র বলল, আচ্ছা দিও না।

মোতাহার হোসেন বললেন, রোজ সকালে তুই কম্পিউটারে কি বাজনা বাজাস ?

শুভ্র আগ্রহ নিয়ে বলল, তোমার কাছে কি বাজনার মতো মনে হয় ? না-কি Noise-এর মতো লাগে ?

বাজনার মতোই লাগে, তবে উল্টাপাল্টা বাজনা। তুই কি কোনো বাজনা শিখতে চাস ? পিয়ানো, বেহালা ?

শুভ্র বলল, না।

মোতাহার হোসেন ছেলের গায়ে হাত রাখলেন।

শুভ্র বলল, বাবা, কফি খাবে ? আমার ঘরে কফি-মেশিন বসিয়েছি। এই দেখ। কফি খেতে চাইলে আমি তোমাকে এক্সপ্রেসো কফি বানিয়ে খাওয়াতে পারি। এই মেশিনে এক্সপ্রেসো কফি হয়।

কফি খাব না।

একটা ছবিতে আমি দেখেছিলাম— ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। ছবির নায়ক গরম এক মগ কফি নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কফি খাচ্ছে। ছবিটা দেখার পর আমি ঠিক করেছিলাম— কোনো একদিন যদি সিরিয়াস বৃষ্টি নামে, তাহলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কফি খাব।

মোতাহার হোসেন বললেন, ঠিক আছে, কফি খাওয়া যাক।

শুভ্র আগ্রহ নিয়ে বলল, কোথায় ভিজবে বাবা, ছাদে না বাগানে ?

তোর যেখানে ইচ্ছা।

তাহলে বাগানে চল। দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে কফি-উৎসব।

As you wish.

বৃষ্টি ভালোই নেমেছে। কফির মগে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। শুভ্র বলল, বাবা, মগে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে কিন্তু কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে না কেন বলো তো ?

মোতাহার হোসেন বললেন, জানি না।

শুভ্র বলল, সব কিছুই রিলেটিভ। কফি যে হারে ঠাণ্ডা হচ্ছে আমরাও হচ্ছি। কাজেই টেম্পারেচার ডিফারেন্স থেকেই যাচ্ছে।

ও আচ্ছা।

বাবা, তুমি কি জানো মাঝে-মাঝে অন্ধকারেও বৃষ্টি দেখা যায় ?

না জানি না।

প্রকৃতি নানান মজা করে। সমুদ্র-ফেনায় ফ্লোরেসেন্ট আলো দিয়ে দেয় বলে অন্ধকারে সমুদ্র-ফেনা দেখা যায়। একইভাবে বৃষ্টির পানিতেও হঠাৎ হঠাৎ ফ্লোরেসেন্ট দিয়ে দেয়, তখন অন্ধকারে বৃষ্টি দেখা যায়।

ও আচ্ছা।

বাবা, আমি এখন কী করছি জানো ? সুন্দর সুন্দর দৃশ্য গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছি— যাতে অন্ধ হয়ে যাবার পরেও স্মৃতি থেকে দৃশ্যগুলি দেখতে পারি।

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

জাহানারা মাইগ্রেনের ব্যথায় কাতর হয়েছিলেন। ব্যথা প্রবল হলে তিনি দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। ঘর থাকে অন্ধকার। এই সময় তার ঘরে কারোরই আসার হুকুম নেই। শুধু সকিনা আসতে পারে। সে বাটি ভর্তি বরফ মেশানো পানি নিয়ে আসে। সেই হিমশীতল পানি দিয়ে তার পায়ের তালু মুছিয়ে দেয়। এতে মাইগ্রেনের ব্যথা সামান্য আরাম হয়।

সকিনা বাটি ভর্তি পানি এনেছে। পায়ের তালু মুছিয়ে দিচ্ছে। জাহানারা আরাম পাচ্ছেন। সকিনা নিচু গলায় বলল, মা, উত্তরের জানালাটা একটু খুলব ? জাহানারা বিস্মিত হয়ে বললেন, বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, তুমি জানালা খুলবে কেন ? তাছাড়া জানালা কেন বন্ধ করা হয়েছে তুমি জানো। মাইগ্রেনের ব্যথা উঠলে আমি জানালা বন্ধ করি। মাঝে-মাঝে তুমি যে উদ্ভট কথা বলো, আমার খুব রাগ লাগে।

সকিনা বলল, মা, আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দেন।

জাহানারা বললেন, হঠাৎ জানালা খোলার কথাটা তোমার মনে এসেছে কেন— এটা বলো।

জানালা খুললে একটা মজার দৃশ্য দেখতে পেতেন।

কী মজার দৃশ্য ?

সকিনা জবাব দিল না। জাহানারার পায়ে হাত বুলাতে থাকল। জাহানারার ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে পা দিয়ে একটা লাথি দিতে। এই মেয়ে মাঝে-মাঝে রাগ দেখায়। রাগ দেখিয়ে কথা বন্ধ করে দেয়। তুই দুই পয়সার চাকরানি, তোর আবার রাগ কী ?

সকিনা!

জি মা।

জানালা খুললে কী মজার দৃশ্য দেখব ?

সকিনা জবাব দিল না। জাহানারার পায়ে ঠাণ্ডা হাত ঘষতে লাগল। জাহানারা উঠে বসতে বসতে কঠিন গলায় বললেন, যাও জানালা খোল। দেখি কী দৃশ্য। আর একটা কথা মন দিয়ে শোন সকিনা। আমি যে-কোনো দিন তোমাকে বিদায় করে দেব। তোমাকে দিয়ে আমার পোষাচ্ছে না। তুমি গাট্টি-বোচকা নিয়ে চলে যাবে। যে গর্ত থেকে এসেছিলে সেই গর্তে ঢুকবে। সেটা কাল সকালেও হতে পারে, আবার একমাস পরেও হতে পারে।

জাহানারা এসে জানালার পাশে দাঁড়ালেন এবং হতভম্ব হয়ে গেলেন। শুভ্র এবং শুভ্র'র বাবা দোলনায় বসে আছে। তাদের দু'জনের হাতেই মগ। তারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মগে চুমুক দিচ্ছে। জাহানারা বললেন, কী হচ্ছে এসব ?

সকিনা বলল, দুজনে মজা করছেন।

এটা কী রকম মজা ? শুভ্র'র বাবা কি জানে না যে শুভ্র'র ঠাণ্ডার ধাত ? সকিনা যাও, আমার জন্যে ছাতা নিয়ে আস। আমি জিজ্ঞেস করব এই ফাজলামির মানে কী ?

সকিনা ক্ষীণ স্বরে বলল, মজা করছে করুক না মা।

জাহানারা তীব্র গলায় বললেন, এটার নাম মজা ? একে মজা বলে ?

সকিনা জবাব দিল না। রাগে-দুঃখে জাহানারার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি লুকানোর চেষ্টাও করছেন না। দু'জনে মিলে বৃষ্টিতে মজা করে ভিজছে, তাকে কিছু বলেও নি। তিনিও নিশ্চয়ই কফির মগ হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে পারতেন।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র এবং শুভ্র'র বাবা এরা আমাকে দেখতে পারে না— এটা তুমি জানো ? এই বাড়িতে তোমার যে অবস্থান আমার অবস্থান তারচে' আলাদা কিছু না।

শুধু শুধু মন খারাপ করবেন না মা।

শুধু শুধু মন খারাপ করছি না, আমি সত্যি কথা বলছি। আমার ছেলে সবাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, অধু, বধু, গদু কেউ বাদ নেই, শুধু আমি বাদ।

ভাইজান ভেবেছেন আপনি ম্যাজিক দেখলে মজা পাবেন না— এই জন্যে আপনাকে দেখান নি।

তুমি উল্টা-পাল্টা কথা বলবে না। থাপ্পর খাবে। তোমাকে ছেলের হয়ে উকালতি করতে হবে না। তুমি হাইকোর্টের ব্যারিস্টার না। তুমি দুই পয়সার চাকরানি। বুঝেছ ?

জি মা বুঝেছি।

একটা টাওয়েল রেডি করে রাখ। শুভ্র'র বৃষ্টি-বৃষ্টি খেলা শেষ হলেই নিজে উপস্থিত থেকে তাকে মাথা মোছানোর ব্যবস্থা করবে। গরম চা বানিয়ে দেবে। টাওয়েল দিয়ে মাথা পুরোপুরি শুকানো যাবে না। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাবে। কাজটা আমিই করতাম। কিন্তু আমি আগামী দু'দিন ছেলের মুখ দেখব না।

মা, আপনি শুয়ে পড়ুন।

আমাকে নিয়ে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। ওরা যতক্ষণ বাগানে বসে থাকবে, ততক্ষণ আমি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকব। আচ্ছা, ওরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে ?

জি-না, দেখতে পাচ্ছে না। ঘর তো অন্ধকার, এই জন্যে দেখতে পাচ্ছে না।

'দেখতে পাচ্ছে না' এইটুকু বললেই হবে। কেন দেখতে পাচ্ছে না— সেই ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে হবে না। তুমি সায়েনটিস্ট না। তুমি আইনস্টাইনের ভাতিজি না। তুমি দুই পয়সা দামের চাকরানি। এই কথাটা তো তোমার মনে থাকে না। তুমি মনে রাখবে।

সকিনা বলল, মা, আমার মনে থাকে।

জাহানারা বললেন, আবার মুখে মুখে কথা ?

তিনি সকিনার দিকে ঘুরে তাকালেন এবং শরীরের সব শক্তি দিয়ে তার গালে চড় মারলেন। সকিনা চমকাল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। জাহানারা খুবই স্বাভাবিক গলায় বললেন, ওরা তো কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ বসে আছে। ঠিক না সকিনা ?

সকিনা জবাব দিল না। জাহানারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা সেরে গেছে।

বৃষ্টি কমে এসেছে। ঝিরঝির করে এখনো পড়ছে, সেটা না পড়ারই শামিল। তবে বাতাস আছে। বাতাস অসম্ভব শীতল। হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে দেয়। মোতাহার হোসেন বললেন, ঠাণ্ডা কেমন দেখেছিস ? এক্কেবারে সাইবেরিয়ার ঠাণ্ডা। চল উঠে পড়ি।

শুভ্র জবাব দিল না। মোতাহার হোসেন বললেন, তোর যদি ঠাণ্ডা লাগে, তোর মা আমাকে জ্যান্ত পুতে ফেলবে। তোর শীত লাগছে না ?

শুভ্র বলল, লাগছে। আবার বসে থাকতেও ভালো লাগছে।

মোতাহার হোসেন বললেন, তাহলে বরং আরো কিছুক্ষণ বসে ঠাণ্ডা খাই। আচ্ছা শোন, আমাদের ধর্মে যে সাতটা দোজখের কথা আছে— এর মধ্যে একটা না-কি ঠাণ্ডা দোজখ ?

ঠাণ্ডা দোজখ বলে কিছু নেই। তবে একটা দোজখ আছে যেখানে শারীরিক শাস্তি দেয়া হয় না। মানসিক শাস্তি দেয়া হয়।

দোজখটার নাম কী ?

হোতামা।

আমার মনে হয় আমার স্থান হবে হোতামায়।

শুভ্র বলল, তুমি কোনো দোজখেই যাবে না। You are a good man. তুমি কোনো অন্যায় কর নি।

মোতাহার হোসেন বললেন, Thank you my son. আমি বড় অন্যায় আসলেই করি নি, তবে ছোটখাটো অন্যায় করেছি।

শুভ্র বলল, ছোটখাটো অন্যায় করে থাকলে বড় অন্যায়ও করেছ।

মোতাহার হোসেন বললেন, তার মানে কী ?

অন্যায়ের ব্যাপারটা রিলেটিভ। আইনস্টাইনের দু'টা থিওরি আছে— থিওরি অব রিলেটিভিটি এবং স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি। এই থিওরি বস্তুজগতের জন্যে যেমন সত্যি, আমার ধারণা মনোজগতের জন্যেও সত্যি। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলব বাবা ?

বল।

মনে কর তুমি তোমার অফিসের একজন লোককে চাকরি থেকে ছাটাই করে দিলে। তোমার দিক থেকে ছোট একটা অন্যায় করলে। চাকরি ছাটাই হয়ে যাওয়ার কারণে লোকটা পড়ল মহাবিপদে। সে দ্বিতীয় চাকরি জোগাড় করতে পারল না।

তার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করল। একটা ছেলে মারা গেল বিনা চিকিৎসায়। তার বড় মেয়েটি প্রসটিটিউট হয়ে গেল। এখন তুমি বলো, এই লোকটির কাছে তোমার সামান্য অপরাধটাই কি অনেক বড় অপরাধ না ?

হ্যাঁ।

আবার তৃতীয় একজনের কাছে কী মনে হবে ? এই হচ্ছে থিওরি অব রিলেটিভিটি। Absolute বলে কিছু নেই, সবই রিলেটিভ। এই আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি— এই ব্যাপারটা আমার কাছে এক রকম। তোমার কাছে আরেক রকম। আবার অন্য একজন অবজারভারের কাছে অন্য রকম।

মোতাহার হোসেন বললেন, প্রসঙ্গটা থাক।

শুভ্র ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা থাক।

শুভ্র টাওয়েল দিয়ে মাথা মুছছে। সকিনা পিরিচে ঢাকা চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র বলল, চা খাব না।

সকিনা বলল, একটা চুমুক হলেও দিন। নয়তো মা রাগ করবেন।

শুভ্র চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিল। চুমুক দিয়ে বলল, মসলা চা না-কি ? গরম মসলার গন্ধ। চা-টা ভালো হয়েছে। আমি পুরোটাই খাব।

সকিনা ইতস্তত করে বলল, ভাইজান, আপনাকে একটা কথা বলব যদি রাগ না করেন।

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, কী কথা ?

সকিনা বলল, আমাদের গ্রামে একটা অদ্ভুত গাছ আছে। লোকে বলে বহু কাল আগে কুমিরের পিঠে চড়ে এক সাধু এসেছিলেন। তিনি এই গাছ পুঁতেছেন। সাত বছর পরে পরে সেই গাছে ফুল ফোটে। সবুজ আর নীল রঙের মিশাল দেয়া ফুল। আমি খবর পেয়েছি গাছে ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। আমার খুবই শখ আপনারে এই গাছের ফুলগুলো দেখাব।

গাছটার নাম কী ?

কেউ নাম জানে না ভাইজান। সবাই বলে অচিনবৃক্ষ।

বাহ্ কী সুন্দর নাম— অচিনবৃক্ষ!

সবাই বলে গাছে যখন ফুল ফুটে, তখন গাছে হাত দিয়ে আল্লাহপাকের কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।

কত বড় গাছ ?

অনেক বড় ভাইজান। রেন্টি গাছের মতো বড়। তেঁতুল গাছের পাতার মতো চিরল বিরল পাতা।

তুমি কি এই গাছের কাছে কখনো কিছু চেয়েছ ? সাত বছর আগে যখন ফুল ফুটল তখন ?

ভাইজান, তখন তো আমার বিচার-বুদ্ধি ছিল না।

শুভ্র আগ্রহ নিয়ে বলল, এখন তো তোমার বিচার-বুদ্ধি হয়েছে। এখন তুমি গাছের কাছে কী চাইবে ?

সকিনা জবাব দিল না। শুভ্র বলল, তোমাদের গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

সকিনা বলল, কুষ্টিয়ার মেহেরপুর। গ্রামের নাম নিমতলি, পোস্টাফিস নিমতলি।

শুভ্র বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের গ্রামের অচিনবৃক্ষ দেখতে যাব।

বর্ষার মধ্যে যেতে হবে ভাইজান। আষাঢ়-শ্রাবণ— এই দুই মাস ফুল থাকে।

শুভ্র বলল, আমি এই বর্ষার মধ্যেই যাব। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সকিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হয় আরো কিছু বলার আছে। শুভ্র বলল, আর কিছু বলবে ?

সকিনা না-সূচক মাথা নাড়ল। তারপর অতিরিক্ত ব্যস্ততায় ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেল।

শুভ্র কম্পিউটার খুলল। নোটবুকে লিখে রাখতে হবে অচিনবৃক্ষের ব্যাপারটা।

> নিমতলি গ্রামের অচিনবৃক্ষ দেখতে যাব। বর্ষাকালে এই বৃক্ষে সবুজ আর নীল রঙের ফুল ফোটে। এই গাছটির পাতা তেঁতুল পাতার মতো চিরল বিরল।

শুভ্র'র নোট বই ভর্তি নানান পরিকল্পনা। যার কোনোটিই এখনো করা হয় নি।

> বনের ভেতর আষাঢ়ি পূর্ণিমা দেখতে যাব। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সবসময় বৃষ্টি হয়। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে বনের জোছনা খুব সুন্দর হওয়া উচিত। বৃষ্টি হলেও বা ক্ষতি কী! বনের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ শোনাও ইন্টারেস্টিং হবার কথা। আচ্ছা গৌতম বুদ্ধ যে গৃহত্যাগ করেছিলেন তার সঙ্গে কি পূর্ণিমার কোনো সম্পর্ক ছিল ? পূর্ণিমা কি তাঁকে গৃহত্যাগে প্রভাবিত করেছে ?
>
> বরফের দেশে জোছনা দেখতে যেতে হবে। বরফের দেশে আমি অনেকবার গিয়েছি। সবই সামারে। আমার ধারণা বরফে জোছনা খুব সুন্দর হবে। শীতের সময় জোছনার খবরাখবর নিয়ে ভুটান গেলে ভালো হবে।

শুভ্র ফাইল বন্ধ করে ইন্টারনেটে গেল। আত্রলিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে। বৃষ্টিতে ভেজার অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতাটা আত্রলিতাকে বলতে ইচ্ছা করছে।

কেমন আছ আত্রলিতা ?

ভালো। খুব ভালো। অসম্ভব ভালো।

বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা মিটে গেছে ?

হ্যাঁ।

দু'জন একসঙ্গে কনসার্টে বাজনা বাজাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কী বাজনা ?

নাচের বাজনা ওয়াল্টজ।

তোমার আনন্দে আমি আনন্দিত।

তোমার চোখ কেমন ?

এখনো দেখতে পাচ্ছি।

আজ সারাদিনের সবচে' সুন্দর দৃশ্য কী ?

দোলনায় দোল খেতে খেতে বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য।

তোমার মা কি এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছেন ?

এখনো দাঁড়ান নি। তবে দাঁড়াবেন।

তোমার প্রতি তোমার মা যে ভালোবাসা দেখাচ্ছেন, তোমার কি মনে হয় না তাতে বাড়াবাড়ি আছে ?

হ্যাঁ মনে হয়।

বাড়াবাড়ি ভালোবাসার কারণ কী তুমি জানো ?

জানি।

আমাকে বলবে ?

শুভ্র ক্যাপিটাল লেটারে অনেক বড় অক্ষরে লিখল— NO.

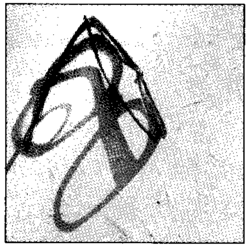

আজ নিয়ে আঠারো দিন পার হলো মনজু 'মায়া লজে'র এক তলায় বাস করছে। আঠারো দিনে তার কোনো ডিউটি পড়ে নি। ছোট সাহেব বাড়ি থেকে বের হন নি। সেও আটকা পড়ে আছে। তার কোথাও যাবার কোনো উপায় নেই। কখন ডাক পড়ে! 'মায়া লজে'র সামনের রাস্তার পাশে চায়ের দোকান পর্যন্ত সে যেতে পারে। ডিউটির ডাক পড়লে দারোয়ান এসে ডেকে নিয়ে যাবে। চায়ের দোকানে তো সারাদিন বসে থাকা যায় না।

গত আঠারো দিনে তিনবার তার মনে হয়েছে— 'ধুত্তুরি! চাকরিতে পিসাব করি। আমি চললাম।' যেটা মনে হয় সেটা করা কখনোই সম্ভব হয় না। চাকরিটা তার খুবই দরকার। যদিও সে সবাইকে বলে বেড়ায় বাবা-মা কেউ নেই, সেটা ঠিক না। বাবা মারা গেছেন ঠিকই। মা আছেন এবং মা'র ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতন আছে সৎবাবা। সৎবাবার কোনো কাজ-কর্ম নাই। তবে নানাবিধ কু-নেশা আছে। তাকে নিয়মিত গাঁজা খেতে হয়। গাঁজা খেলে শরীর ঠিক রাখার জন্যে দুধ খেতে হয়। বলকারক খাওয়া-দাওয়াও খেতে হয়। মনজুর মা রহিমা বেগম এইসব বলকারক খাওয়া এবং নেশার জোগান দেয়ার জন্যে অতি ব্যস্ত থাকেন। নিম্নশ্রেণীর এই মানুষটির প্রতি তার মা'র সীমাহীন মমতার (কিংবা প্রেম) কোনো কারণ মনজু জানে না।

মনজুর দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সবচে' ভালো বিয়ে যার হয়েছে, তার স্বামী ইতালিতে জুতার দোকানে কাজ করত। যখন সব ঠিকঠাক সে তার স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে ইতালিতে নিয়ে যাবে, তখনই খবর পাওয়া গেল বাবাজি জনৈকা স্প্যানিশ কন্যা বিয়ে করে ফেলেছে।

মনজুর সেই বোন এখন দুই বাচ্চা নিয়ে তার মা'র কাছে উঠে এসেছে। মনজুর সৎবাবা ইসমাইল সর্দার প্রথম কিছু দিন খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করেছেন— তালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ ? আমারে তুমি চিন না ? তোমারে আমি ইতালির কুত্তার গু চেটে খাওয়াব। এম্বেসির মাধ্যমে যখন মামলা শুরু হবে, তখন পাতলা পায়খানা করতে করতে তোমার জীবন যাবে। স্ত্রীর পায়ে তো ধরবেই, দুই শিশুপুত্রের পায়ে ধরেও মাফ চাইতে হবে। ইসমাইল সর্দারের ঝাঁপাঝাঁপি লাফালাফি দুই-তিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে পড়ল। তার সময় কাটতে

লাগল স্বামী-পরিত্যক্ত অনজুর দুই যমজ পুত্রের সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করে। এদের সর্বশেষ খবর মনজু তার মা'র চিঠিতে পেয়েছে। মা লিখেছেন—

মনজু

দোয়াগো।

বাপজান, পর সংবাদ তোমার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। আল্লাহপাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া। তুমি যে ভালো চাকরি পাইবে, ইহা তোমার সৎবাবা আগেই খোয়াবে পাইয়াছেন। তিনি শেষরাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলেন তুমি অতি বৃহৎ একটি কাতল মাছ হাতে নিয়া বাড়ি ফিরিতেছ। তোমার সৎবাবা মানুষটা গাঁজা-ভাঙ যাই খাক, তাহার ভিতরে কিছু পীরাতি আছে। সাক্ষাতে তোমার সৎবাবার পীরাতির কিছু টুকটাক কথা তোমাকে বলিব। তুমি বিস্মিত হইবে।

এখন ঘরের সংবাদ শোন। সংসারের অবস্থা বেহাল। বলা চলে প্রায় উপবাসের সম্মুখীন হইয়াছি। বর্গাদাররা ধান-চাল কিছুই ঠিকমতো দিতেছে না। বাড়ির যে এক অংশ জনৈক এনজিও কর্মীকে ভাড়া দিয়াছি, সেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করিতেছে না। প্রতিমাসেই নানান টালবাহানা করে। অনজু তার দুই পুত্র নিয়া উপস্থিত হওয়াতে আরো ঝামেলায় পড়িয়াছি। অনজুর স্বামী ইতালি হইতে তাহার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়া কাগজপত্র পাঠাইয়াছে। সব কাগজপত্র আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি। অনজু এখনো আশায় আশায় আছে যে ডিভোর্স হয় নাই। যদি জানে ডিভোর্সের কাগজ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে সে কী করিবে তার নাই ঠিক। গলায় ফাঁস দেয়া বা বিষ খাওয়া বিচিত্র কিছু না।

তোমার সৎবাবা অনজুর পুত্র দুইটির খোরপোষ আদায়ের জন্যে মামলা করিতে চান। এই বিষয়ে তিনি অনজুর শ্বশুরের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে চান। তুমি তো জানো, এইসব বিষয়ে তোমার সৎবাবার চিকন বুদ্ধি। তিনি অবশ্যই খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তবে তার জন্যও টাকার প্রয়োজন। তুমি অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা কর।

উনার শরীরও ভালো যাইতেছে না। এই বয়সে বিছানায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারিবে না। আমি কবিরাজের পরামর্শে তার জন্যে ছাগ-দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছি। হাত

একেবারেই খালি। সমস্ত ব্যবস্থাই ধার-দেনা করিয়া করিতে হইতেছে। তুমি অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা কর।

এদিকে অনজুর দুই ছেলে বড় উৎপাত করিতেছে। আমি আমার জীবনে এরকম গুণ্ডাপ্রকৃতির শিশু দেখি নাই। ঘটনা কী হইয়াছে শোন। তোমার সৎবাবার শরীরটা ভালো যাইতেছে না আগেই বলিয়াছি। গত সোমবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ঘুমাইতেছিলেন। তখনই এই দুই গুণ্ডা ঘুমের মধ্যেই তাহাকে কামড়াইয়া ধরে। একজন ঘাড়ে কামড় দেয়। অন্যজন ডান পায়ের হাঁটুতে। রক্তারক্তি কাণ্ড। আমি এবং অনজু আমরা দুইজনে মিলিয়া এই দুই বজ্জাতকে ছুটাইতে পারি না এমন অবস্থা। উনাকে এটিএস ইনজেকশন দেওয়া হইয়াছে। আমি দুই বজ্জাতকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়াছি বলিয়া অনজু আমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার হইয়াছে উভয়সংকট।

যাই হোক বাবা, সংসারের এইসব টুকিটাকি নিয়া তুমি উদ্বিগ্ন থাকিও না। মন লাগাইয়া কাজ কর যেন মালিক সন্তুষ্ট থাকেন।

নিশ্চয়ই এক তারিখে তোমার বেতন হইবে। বেতন হওয়া মাত্র তোমার পক্ষে যতটা পাঠানো সম্ভব ততটা পাঠাইবে। সংসারের অবস্থা ভয়াবহ। সব কথা খুলিয়া বলা যাইতেছে না। এই বিষয়ে আরেকটি জরুরি কথা বলি। পোস্ট অফিসে ইদানীং টাকা মার যাইতেছে। মনিঅর্ডার ঠিকমতো পৌঁছিতেছে না। তোমার সৎবাবা একটি ভালো বুদ্ধি দিয়াছেন। উনি বলিয়াছেন প্রতি মাসের এক তারিখে ঢাকা গিয়া তোমার নিকট হইতে টাকা নিয়া আসিবেন। তাহার আসা-যাওয়াতে কিছু বাড়তি খরচ হইলেও টাকা মার যাইবে না। এসব বিষয়ে উনার বুদ্ধি অতি পরিষ্কার। তুমি কী বলো? উনার নিজের জন্যেও ঘোরাঘুরির কিছু প্রয়োজন আছে। একটা মানুষ তো আর দিনরাত ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। বেচারার এম্নিতেও ভ্রমণের শখ। বয়সকালে দার্জিলিং বোম্বাই এইসব জায়গায় বেড়াইয়াছে। এখন টাকা-পয়সার অভাবে গৃহবন্দি।

কাগজ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর কিছু লিখিতে পারিতেছি না। সংসারের এমন হাল যে চিঠি লেখার কাগজ পর্যন্ত নাই। সবই আল্লাহপাকের পরীক্ষা। উনি দুঃসময় দেন, আবার উনিই সুসময় দেন। বাবাগো, আল্লাহপাককে সর্বদা স্মরণ রাখিও। শুক্রবারের জুম্মার নামাজ যেন কখনো মিস না হয়। তোমার সৎবাবাকেও দেখি অন্য নামাজ পড়তে পারেন বা না পারেন জুম্মার নামাজ মিস হয় না।

ইতি

তোমার মা রহিমা বেগম

মা'র চিঠি মনজু কখনো দ্বিতীয়বার পড়ে না। দ্বিতীয়বার পড়ার মতো কোনো বস্তু চিঠিতে থাকে না। তার সব চিঠি একরকম— অভাবের ঘ্যানঘ্যানানি, প্যানপ্যানানি। মাঝে মাঝে তরকারিতে লবণের মতো ইসমাইল সর্দারের চিকন বুদ্ধির প্রশংসা। মনজু অবশ্যি মায়ের এবারকার চিঠি পাঁচবার পড়ল। ইসমাইল সর্দার কামড় খেয়ে কুপোকাৎ— এই অংশটা পড়ার জন্যেই পাঁচবার পড়া। বাচ্চা দুটার জন্যে অবশ্যই ভালো কোনো উপহার কিনে পাঠাতে হবে। দাঁতের জন্যে আলাদা ভিটামিন। এদের নামও বদলে দিতে হবে। একজনের নাম হবে টুং, আরেকজনের নাম টাং।

মায়ের চিঠির জবাব এখনো লেখা হয় নি। একেক সময় একেক জবাব মাথায় আসছে। যত সময় যাচ্ছে চিঠির জবাবের ভাষা পাল্টে যাচ্ছে। ভাষা নরম হয়ে আসছে। চিঠি পড়ার পর পর যে জবাবটা মাথায় এসেছিল সেটা এক লাইনের জবাব এবং ইংরেজিতে—

Everybody go to hell.

পরদিন মাথায় জবাবটা এলো বাংলায়। ভাষা এত কঠিন না। তবে নরমও না। মাঝামাঝি।

মা শোন, তোমার ইসমাইল সর্দারের প্যানপ্যানানি বন্ধ করবে? অবশ্যই তুমি তাকে আমার কাছে পাঠাবে না। চিকন বুদ্ধির লোক আমার পছন্দ না। তার চিকন বুদ্ধি তোমার জন্য তোলা থাকুক। আমার দুই ভাগ্নেকে আদর ও দোয়া দিবে। তারা উত্তমকর্ম করেছে। তারা যেন নিয়মিত কামড় দেয় তাদেরকে এই পরামর্শ দিবে। এবং শরীর ভালো করার জন্যে তাদেরকেও ছাগ-দুগ্ধ খাওয়াবে। আরেকটা কথা, আমি কোনো টাকা-পয়সা পাঠাতে পারব না। আমার চাকরির কোনো ঠিক নেই। যে-কোনো মুহূর্তে চাকরি চলে যাবে। আর যদি নাও যায়, আমি নিজেই ছেড়ে দেব।

চাকরি ছেড়ে দিব কারণ এই চাকরি আমি করতে পারছি না। আমার কাজ কী জানো ? আমার কাজ— চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকা। যদি ডিউটিতে ডাক পড়ে তাহলে ডিউটিতে যাব। ডিউটির ডাকের জন্যে অপেক্ষা— কী যে কষ্টের ব্যাপার তুমি বুঝবে না। যাদের যাবজ্জীবন হয়েছে, আমার মনে হয় তারাও আমার চেয়ে সুখী...।

এই চিঠিও শেষপর্যন্ত লেখা হয় নি এবং পাঠানো হয় নি। মনজুর আসলে কোনো কিছুতেই মন বসছে না। দিন কাটছে না। প্রতিদিন একই রুটিন— সকালে নাস্তা (নাস্তাও এক রকম, খিচুড়ি ডিম ভাজি), নাস্তার পর ঘরের সামনে সকাল এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকা।

এগারোটার পর শুরু হয় ড্রাইভারদের ক্যারাম খেলা। ঘণ্টা দুই ক্যারাম খেলা দেখা। সবচে' ভালো খেলে চশমা পরা দারোয়ান। সে আবার সিঙ্গেল খেলে না। বাজি ছাড়াও খেলে না। দশ টাকা বাজি রেখে তার সাথে খেলতে হয়। দুপুরের খাওয়ার পর ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সামনের চায়ের দোকানে ঘণ্টা দু'এক বসে থাকা। রাত দশটা থেকে শুরু হয় ড্রাইভারদের তাস খেলা। খেলার নাম কাচ্চু। ঘণ্টা দুই খেলা দেখে ঘুমাতে যাওয়া।

বাড়ির কেয়ারটেকার রহমতুল্লাহ সাহেবের ঘরে টেলিভিশন আছে। কোনো কোনো রাতে নাটক থাকলে নাটক দেখা। এক জোড়া নায়ক-নায়িকা প্রেম করে। কেন করে তারা জানে না। তাদের মধ্যে মিলন হয়। কেন হয় কে জানে! আবার মাঝে মাঝে বিরহ হয়। কী জন্যে হয় তাও বোঝা যায় না।

রহমতুল্লাহ সাহেবের ঘরে টিভি দেখতে যাওয়াও শাস্তির মতো। তিনি সারাক্ষণ শরীর চুলকান এবং কথা বলেন। তার কথাও টিভির নাটকের মতো। কেন বলেন, কী জন্যে বলেন, তিনি জানেন না। তার কমন ডায়ালগ হচ্ছে— মন দিয়ে কাজ কর। কাজে দিবে মন মিলিবে ধন। বাঙালির কোনো আয়-উন্নতি নাই কারণ তাদের কাজে মন নাই। তাদের মন কোথায় ? তাদের মন অজুহাতে। কাজ না করার অজুহাত। বাঙালির তিন হাত। ডানহাত, বামহাত আর অজুহাত। তিনটা হাতের মধ্যে সে ডানহাত-বামহাত কোনোটাই ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে শুধু অজুহাতটা।

বুড়ো যখন বকবক করতে থাকে, তখন মনজু এমন ভাব করে যেন সে বুড়োর প্রতিটা কথা গিলে খাচ্ছে। আসলে সে তখন মনে মনে বলে, 'এই বুড়া, চুপ করবি ? চুপ না করলে টান দিয়ে তোর জিব ছিঁড়ে ফেলব। তুই যখন কথা বলিস, তখন তোর মুখ দিয়ে থুথু বের হয় এটা জানিস ? তোর থুথু খাওয়ার জন্যে বসেছি ?'

রহমতুল্লাহ আবার হঠাৎ হঠাৎ কোত্থেকে মদ খেয়ে আসে। এই সময় তার ব্যবহার হয় অতি মধুর। হাসি ছাড়া মুখে কথা নেই। কথা বলবে গায়ে হাত দিয়ে। মাতালের নেশা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে— এই বুড়োর উল্টো নিয়ম। রাত যতই গভীর হয়, তার নেশা ততই বাড়ে। এক পর্যায়ে শুরু হয় কেচ্ছা কাহিনী। সব কেচ্ছা কাহিনীই 'মায়া লজ' কেন্দ্রিক।

এই যে মনজু মিয়া, এই বাড়িতে ভূত আছে জানো ? ভূত ঠিক না, পেত্নী। অনেকেই দেখেছে। আমি নিজে দেখেছি দুইবার। প্রথমবার দেখি চৈত্র মাসে। হয়েছে কী, সেবার গরম পড়েছে বেজায়। ফ্যানের বাতাসে কোনো কাজ হয় না। উল্টা শরীর জ্বালাপোড়া করে। রাত তখন দুটা-আড়াইটা বাজে। আমি ভাবলাম বাগানে গিয়া বসি। শরীরটা ঠাণ্ডা করে আসি। রওনা হয়েছি বাগানের দিকে, কিছুদূর যাবার পরে দেখি, দোলনায় একটা মেয়েছেলে আপন মনে দোল খাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। প্রথমে মনে হলো ছোট সাহেবের মা। উনি এত রাতে দোলনায় বসে আছেন কেন— এটা বুঝলাম না। বাগানে উনার আসার কথা না। উনি কুত্তা ভয় পান। তাহলে কি কাজের মেয়েদের কেউ ? কাজের মেয়েদের এত সাহস হবার কথা না। আমি ধান্ধায় পড়ে গেলাম। তখন দেখি, দোলনায় বসা মেয়ে হাত ইশারায় আমাকে ডাকল। আমি আগায়ে গিয়েছি। রাত দু'টার সময় দোলনায় বসে থাকে, হাত ইশারায় আমাকে ডাকে, মেয়েটা কে আমার দেখা দরকার। আমার সন্দেহ হলো, ড্রাইভার-দারোয়ান এদের কেউ বাজারের মেয়ে ভিতরে পাচার করেছে কি-না। আগে একবার এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, তাতে তিনজনের চাকরি চলে যায়। তবে দোলনায় বসা মেয়েটাকে বাজারের মেয়ের মতো মনে হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে শাড়ি পরেছে। নিজেকে ঢেকে-ঢুকে খুবই ভদ্রভাবে বসেছে। চুল খোঁপা করা। বাজারের মেয়েরা চুল খোঁপা করে না। ছেড়ে রাখে।

আমি আরো কয়েক কদম আগায়েছি। হাসির শব্দ শুনলাম। মানুষের হাসি না। জন্তু-জানোয়ারের হাসি। ভকভক শব্দ। মেয়েটা হাসছে নাকি ? এটা কী রকম হাসি ? আমি বললাম, তুমি কে ? বলে তাকিয়েছি, দেখি মেয়েটা ঠিকই দোলনায় বসে আছে, তবে তার গায়ে একটা সুতা নাই। ঘটনা এইখানে শেষ না। মেয়েটা তখন কথা বলা শুরু করল। মিষ্টি গলার স্বর। আমাকে বলল, গরম বেশি বলে কাপড়-চোপড় খুলে ফেললাম। তুই মনে কিছু নিস না। তুই আমার ছেলের মতো। ছেলের সামনে মায়ের আবার লজ্জা কী ? আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আমার জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে।... আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না ? যদি আমি একটা শব্দ মিথ্যা বলি, তাহলে আমি সতী মায়ের গর্ভের সন্তান না। আমি জারজ, আমার পিতা জারজ। এখন বিশ্বাস হয় ?

নতুন চাকরি করতে এসেছ। মনে অনেক রঙ ঢঙ। শোন মজনু মিয়া, এই বাড়ি কোনো সহজ বাড়ি না। এই বাড়ি জটিল বাড়ি। এই বাড়ির হিসাব জটিল হিসাব। তুমি ভাবতেছ আমি এক মাতাল লোক। মাতালের কথার হিসাব নাই। ভুল ভাবতেছ। বেহিসেবি কথা কয় সুস্থ মানুষ। মাতাল বলে হিসাবের কথা। সমস্যা একটাই, তোমাদের মুখে ছাকনি আছে। মাতালের মুখে ছাকনি নাই।

এই বাড়ির আরেকটা হিসাব একটু বিবেচনা কর— ছোট সাহেবরে তো দেখেছ, তোমার শুভ্র ভাইজান। তার মতো সুন্দর চেহারার যুবক দেখেছ? দেখ নাই। দেখার উপায় নাই। তার মতো সুন্দর আরেকটা পুরুষ জন্মেছিল। তার নাম জানো? হাদিস-কোরান পড়বা না, নাম জানবা কীভাবে? তিনিও একজন নবী। তার নাম ইউসুফ। যার প্রেমে পাগল হয়েছিলেন জুলেখা বিবি। এখন কথা হলো, আমাদের ছোট সাহেবের চেহারা রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও সুন্দর। তার পিতার চেহারা ছবি কী? পোড়া কাঠ। লঙ্কার হনুমান। আর মা'র চেহারা কী? বিড়ালমুখি। দেখলে মনে হয় সাদা হুতা বিড়াল। Cat women। এত সুন্দর একটা ছেলে যে তাদের হয়েছে হিসাবটা কী? মাঝে-মধ্যে চিন্তা করবা। চিন্তার খোরাক দিয়া দিলাম। Food for thought.

চিন্তায় মিলে বস্তু, না চিন্তায় নাই। জাগরণে দেখি না যারে, নিদ্রায় পাই।

তোমারে পছন্দ হয়েছে বলেই ভিতরের দু'একটা কথা বললাম। আরো যদি পছন্দ হয় আরো বলব। বুঝেছ? এখন আর কথা বলতে পারতেছি না। বমি চাপাচ্ছে। আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাও। বমি করব। পিছন দিক দিয়া ধর। সামনে থাকবা না। সামনে থাকলে তোমার শরীরে বমি করতে পারি। বমির পরে আমার হাত-মুখ ধোয়াইয়া বিছানায় শোয়ায়ে দিবা। এবং দুই পায়ের চিপায় দিবা কোলবালিশ।

আমি তোমারে পুত্রের মতো দেখি, তুমি আমারে দেখবা পিতার মতো। এটাই হলো হিসাবের কথা। জগৎ চলে হিসাবে। যিনি জগৎ চালান, আমরা যাকে বলি আল্লাহ, খ্রিষ্টানের পুতরা বলে God, মালাউনরা বলে ঈশ্বর, তিনি অংকে বড়ই পাকা। সবসময় দশে দশ। বুঝেছ? জ্ঞানের কথা বললাম। সব সময় বলি না। তোমাকে স্নেহ করি বলে বলেছি। ওয়াক ওয়াক ওয়াক! শালার বমি। তুই থাকস কই?

'মায়া লজে'র স্টাফদের বেতন হয় মাস পুরা হবার একদিন আগে। ত্রিশা মাস হলে ত্রিশ তারিখে, একত্রিশা মাস হলে একত্রিশ তারিখে। বেতন দেন রহমতুল্লাহ। রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করে বেতন নিতে হয়। মনজু তার জীবনের প্রথম বেতন নিল। ছয় হাজার টাকা অ্যাডভান্সের কিছু বেতন থেকে কাটার কথা। দেখা গেল

বেতন কাটা হয় নি। রহমতুল্লাহ বললেন, বেতন আসে হেড অফিস থেকে। তারা কাটে নাই। হেড অফিস কোনোদিন ভুল করবে না। তোমাকে যে অ্যাডভান্স দেয়া হয়েছিল সেটা মাফ হয়ে গেছে। মনজু বলল, মাফ হবে কেন?

রহমতুল্লাহ বললেন, কোম্পানিতে যারা চাকরিতে ঢুকে, তাদের সবাইকে প্রথমে এক মাসের বেতন লোন হিসেবে দেওয়া হয়। মাসে মাসে কাটা হবে এরকম বলা থাকে। শেষপর্যন্ত কাটা হয় না। এই কোম্পানিতে চাকরির এটা এক সুবিধা।

মনজু আনন্দিত গলায় বলল, বলেন কী?

রহমতউল্লাহ বললেন, অত খুশির কিছু নাই। সুবিধা যেমন আছে অসুবিধাও আছে।

মনজু বলল, অসুবিধা কী?

রহমতউল্লাহ বললেন, এত প্যাঁচাল তোমার সঙ্গে পারতে পারব না। সুবিধা-অসুবিধা নিজেই জানবা।

মনজু বলল, চাচাজি, আমি কি ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে ছুটি পাব? এতদিন ধরে এক জায়গায় পড়ে আছি, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

রহমতউল্লাহ বললেন, চাকরির অসুবিধার কথা জানতে চেয়েছিলা। এই হলো এক অসুবিধা। দম বন্ধ হয়ে আসে। দম ফেলার জন্যে যেখানে যাবে দেখবে সেখানেও দম বন্ধ। ঘর বাহির সমান। খবর পেয়েছি ছোট সাহেবের শরীর খারাপ, তাঁকে দেখতে ডাক্তার এসেছে। কাজেই যেখানে ইচ্ছা যাও। রাত এগারোটার আগে ফিরবা। এগারোটায় গেট বন্ধ।

রুনু সবসময় লক্ষ করেছে সে যখন খুব মন দিয়ে কিছু করে তখনি কলিংবেল বাজতে থাকে। সেই কলিংবেলের শব্দ বাড়ির আর কেউ শোনে না। শুধু সে একা শুনতে পায়।

রুনু তার বান্ধবীর নোট কপি করছিল। একগাদা নোট সকালে ফেরত দিতে হবে। এই সময় কলিংবেল বাজছে। বাসায় বাবা আছে, মা আছে, একটা কাজের মেয়ে আছে। কলিংবেলের শব্দ কেউ শুনছে না। রুনু ঠিক করল, কলিংবেল বাজতে থাকুক, সে দরজা খুলবে না। বাসায় দরজা খোলার দায়িত্ব শুধু তার একার কেন হবে? বাড়ির অন্য সদস্যরা যদি সময় সময় বধির হতে পারে, তাহলে সেও পারে।

শেষপর্যন্ত রুনুকেই উঠতে হলো। মহাবিরক্ত হয়ে সে দরজা খুলল। দুই হাতে দুই বাজারের ব্যাগ নিয়ে মনজু দাঁড়িয়ে আছে। রুনু বলল, একী!

মনজু বলল, রুনু, ভালো আছ?

রুনু চিৎকার দিয়ে বলল, মা, মনজু ভাই এসেছে।

চিৎকার দিয়ে সে নিজে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ল। সে ভেবেই পাচ্ছে না এত জোরে সে চিৎকারটা কেন দিল! মনজু ভাই কি এমন কেউ যে তাকে দেখে কানের পর্দা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে হবে?

শায়লা রান্নাঘরে মাছ কুটছিলেন, তিনি সেখান থেকে ছুটে এলেন। ইকবাল সাহেব ভেতরের বারান্দায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি চলে এলেন কাগজ হাতে। সবার ব্যস্ততা এমন যে এই বাড়ির অতি প্রিয় একজন দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পর ফিরে এসেছে। শায়লা বললেন, বাবা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমাদের একটা খোঁজ দিবে না?

ইকবাল সাহেব বললেন, একটা ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে গেলে আমিই খুঁজে বের করতাম। কিছুই রেখে যাও নাই। তোমার তো দেখি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নাই।

রুনু বলল, ব্যাগে করে কী এনেছেন বের করেন।

মনজু বলল, সামান্য কাঁচাবাজার। মাছ-মাংস।

রুনু বলল, লোকজন আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে এলে মিষ্টি আনে, দই আনে। আপনি আনেন কাঁচাবাজার। আপনার এই অদ্ভুত অভ্যাস কেন?

মনজু বলল, মা'কে খুঁশি করার জন্যে কাঁচাবাজার আনি। পৃথিবীর সমস্ত মায়েরা কাঁচাবাজার দেখলে খুশি হয়।

রুনু বলল, পৃথিবীর সমস্ত মায়েদের খবর আপনি জেনে গেছেন? আপনি কাঁচাবাজার আনেন কারণ আপনি পেটুক মানুষ, খেতে পছন্দ করেন।

মনজু ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করছে। সবাই আগ্রহ করে দেখছে। প্রথমে বের হলো মাঝারি সাইজের একটা কাতল মাছ। ইকবাল সাহেব বললেন, মাছটা ফ্রেস আছে। বিলের কাতল। টেস্ট ভালো।

তারপর বের হলো একটা ইলিশ মাছ। মোটামুটি বড় সাইজের গলদা চিংড়ি। বড় বড় শিং মাছ। কিছু মলা মাছ। খাসির একটা আস্ত পা।

শায়লা আনন্দিত গলায় বললেন, এত কিছু এনেছ কেন? তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়েছে? রাতে কী খাবে বলো? রাতে কী রান্না করব?

মনজু বলল, ঝাল দিয়ে শিং মাছের ঝোল রান্না করেন। শিং মাছের ঝোল খেতে ইচ্ছা করছে।

আর কী খাবে? ভাপে ইলিশ করব?

করেন।

তোমার মামা এনেছে পাবদা মাছ। আজ তিন রকম মাছ থাকুক।

রুনু বলল, ভাপে ইলিশ আমি রান্না করব মা।

শায়লা বললেন, তোর রান্না করতে হবে না। তুই মনজুর সঙ্গে গল্প কর।

রুনু বলল, দুই দিন পরে আমার পরীক্ষা, এখন আমি উনার সঙ্গে গল্প করব? তোমার ছেলে তুমি গল্প কর। আমার এত গল্প করার শখ নাই।

শায়লা রান্না বসিয়েছেন। ইকবাল সাহেব মোড়া পেতে রান্নাঘরে বসে আছেন। আয়োজনের রান্না-বান্না দেখতে তার ভালো লাগে। তার হাতে চায়ের কাপ। খুবই আরাম করে তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। শায়লা বললেন, আমি একটা বিষয়ে মনস্থির করেছি। তুমি কোনো আপত্তি করতে পারবে না।

ইকবাল সাহেব বললেন, কোন বিষয়ে?

শায়লা বললেন, কোন বিষয় তা তুমি অনুমান করতে পারছ। পারছ না?

হুঁ।

তোমার কিছু বলার আছে?

ইকবাল সাহেব বললেন, ছেলে খুবই ভালো কিন্তু মেয়ের মতামতের একটা বিষয় আছে।

শায়লা বললেন, তার আবার কিসের মতামত?

ইকবাল সাহেব বললেন, আমার অবশ্য ধারণা মেয়ে ছেলেটাকে খুব পছন্দ করে। যে চিৎকার দিয়েছিল এখনো কানে তালা লেগে আছে। তবে সমস্যা একটা আছে।

কী সমস্যা?

ইকবাল সাহেব বললেন, ছেলের মা নাই বাবা নাই— অনাথ ছেলে।

শায়লা বললেন, ছেলের মা-বাবা থাকবে না কী জন্যে? আমি মা-না? তুমি এই বিষয়ে কোনো উল্টা কথা বলবা না। অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাও বলো। এই বিষয়ে না।

ইকবাল সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টালেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, এক কাজ করি, খাসির মাংসটা আমি রান্না করে ফেলি। টাটকা টাটকা খাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

শায়লা বললেন, তুমি রাঁধতে চাইলে রাঁধ। কাটা মসলার মাংস কর। এটা তোমার ভালো হয়। মাংস রাঁধতে হলে কিন্তু আদা-পেঁয়াজ আনতে হবে। ঘরে আদা-পেঁয়াজ নেই।

রান্নাবান্নায় এই ভদ্রলোকের খুবই শখ। মাঝে-মধ্যেই এটা-সেটা রান্না করেন। তিনি খুবই আগ্রহ নিয়ে আদা-পেঁয়াজ আনতে রওনা হলেন।

রুনু অতি মনযোগে বান্ধবীর নোটবুক কপি করছে। তার সামনেই মনজু বসে আছে। মনজুর সঙ্গে তার কোনো কথা হচ্ছে না। মনজুর দিকে না তাকিয়েও সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মনজু তাকিয়ে আছে তার দিকে। কোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তার একেবারেই ভালো লাগে না। গা ঘিনঘিন করে। এখন করছে না। বরং ভালো লাগছে। লজ্জাও লাগছে। এই লজ্জার মধ্যেও আনন্দ মিশে আছে।

রুনু বলল, আপনি চুপচাপ বসে আছেন কেন ?

মনজু বলল, তুমি কাজ করছ, চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার গতি কী!

আপনার অফিস কেমন চলছে ?

ভালো, তবে খুবই কাজের চাপ। এতদিন আসতে পার নি কাজের চাপে। আমার যে ইমিডিয়েট বস উনি হঠাৎ ছুটিতে গেলেন। স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছে, স্ত্রীকে নিয়ে তাকে যেতে হলো সিঙ্গাপুর। তার সমস্ত কাজ এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। আমি নতুন মানুষ, আমি কি এতসব জানি ? পনেরো দিনে একবার গেলাম চিটাগাং। আর ছ'বার গেলাম খুলনায়। বিমানে যাতায়াত করেছি, তারপরেও ধকল কম না।

রুনু বলল, মনজু ভাই, আপনার কথা বলার মধ্যে মনে হয় কোনো সমস্যা আছে। আপনি যখন কথা বলেন তখন মনে হয় মিথ্যা বলছেন।

কী বলো ?

আসলেই তাই। আপনার প্রতিটি কথা মিথ্যার মতো শোনাচ্ছে। যদিও আমি জানি আপনি মিথ্যা বলছেন না। আগেও এরকম মনে হয়েছিল। চাকরি নিয়ে কথা বলেছিলেন, আমার কাছে মনে হয়েছিল মিথ্যা। পরে দেখা গেল সত্যি।

মনজু চিন্তিত গলায় বলল, এরকম কেন হয় বলো তো ?

রুনু বলল, জানি না কেন হয়। মনে হচ্ছে আপনার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে কোনো সমস্যা আছে। আপনি একটা কাজ করুন— ভয়ঙ্কর কোনো মিথ্যা বলুন, দেখি মিথ্যাটা সত্যির মতো মনে হয় কি-না।

মিথ্যা বলব ?

হুঁ।

বেশ তাহলে শোন, আগে বলেছিলাম না আমার মা মারা গেছেন ? আসলে মা বেঁচে আছেন। ভালো মতো বেঁচে আছেন। ইসমাইল সর্দার নামে অতি বদলোককে বিয়ে করেছেন। এই স্বামীর প্রতিভায় আমার মা মুগ্ধ।

রুনু বলল, আপনার মিথ্যাগুলি আমার কাছে সত্যি মনে হচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো!

মনজু চিন্তিত গলায় বলল, আশ্চর্য তো বটেই।

রাতে মনজু চলে যাবে। এগারোটায় গেট বন্ধ হয়। তার আগেই যেতে হবে। শায়লা বললেন, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে আমি ছাড়ব না। মনজু বলল, রাত এগারোটার মধ্যে উপস্থিত না হলে আমার চাকরি চলে যাবে মা।

রুনু বলল, চাকরি চলে গেলে চলে যাবে, আপনি যেতে পারবেন না।

মনজু বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, থাকব।

শায়লা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন। তাকে তখন মনে হচ্ছিল তিনি এই পৃথিবীর সুখী মা'দের একজন।

ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মনজুকে বিছানা করে দেয়া হয়েছে বসার ঘরের সোফায়। সে বেশ আয়েশ করে শুয়েছে। পায়ের কাছের জানালা খোলা। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট আসছে। মনজুর ভালো লাগছে। ঘুম ঘুম লাগছে, আবার ঘুম আসছে না— এমন অবস্থা।

মনজু ভাই, পান খাবেন ?

রুনু হাতে পানের খিলি নিয়ে ঢুকেছে। তার মুখেও পান। পানের লাল রঙ ঠোঁট বেয়ে নেমে এসেছে। দেখতে খুব ভালো লাগছে। মনজুর মনে হলো এই মেয়েটা যদি তার স্ত্রী হতো তাহলে সে অবশ্যই হাত দিয়ে ঠোঁটের লাল রঙ মুছিয়ে দিত।

মনজু বলল, রুনু বসো।

রুনু বলল, বসব কেন ? আপনি কি ভেবেছেন আমি পান হাতে নিয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। আমি এক্ষুণি পড়তে বসব। আজ রাত তিনটা পর্যন্ত আমার পড়ার প্ল্যান।

মনজু বলল, সবসময় কি আর প্ল্যান মতো কাজ হয় ?

রুনু বলল, অন্যদের হয় না। আমার হয়।

বলতে বলতে রুনু সোফায় বসল। মনজুর হাতে পান দিতে দিতে মাথা ঘুরিয়ে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মনজু বলল, হাসছ কেন ?

রুনু বলল, বাবা মা আমাকে হঠাৎ বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাত্রও খুঁজতে হয় নি। পাত্র নিজেই এসে ধরা দিয়েছে। এই জন্যে হাসছি।

মনজু বিস্মিত গলায় বলল, পাত্র কে ?

রুনু শব্দ করে হেসে ফেলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, পাত্র আমার পাশে বসে পান খাচ্ছে।

মনজু অবাক হয়ে বলল, বলো কী ?

রুনু বলল, এত খুশি হবেন না। সব নির্ভর করছে আমার উপর। পাত্র আমার পছন্দ হতে হবে।

মনজু অবাক হয়ে ভাবছে মেয়েটা কী সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই। মনজু বলল, পাত্র তোমার পছন্দ না ?

রুনু বলল, না।

মনজু বলল, আমি অবশ্যি পছন্দ করার মতো কেউ না। চেহারা ভালো না। সর্ট। গায়ের রঙও ময়লা।

রুনু বলল, আপনার চেহারা ঠিকই আছে। আপনার যেটার অভাব তার নাম বুদ্ধি।

তোমার ধারণা আমার বুদ্ধি কম ?

হ্যাঁ। আমি সারাজীবন কল্পনা করেছি আমি যাকে বিয়ে করব তার খুব বুদ্ধি থাকবে। চেহারা হবে রাজপুত্রের মতো।

মনজু বলল, কল্পনার মানুষ কল্পনাতেই থাকে, বাস্তবে তাদের পাওয়া যায় না।

রুনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, তা ঠিক। তাছাড়া আমার ভাগ্য এরকম যখন যেটা চেয়েছি তার উল্টোটা হয়েছে। আমি জানি আমার বিয়ে আপনার মতো একজন কারোর সঙ্গে হবে। কে জানে হয়তো আপনার সঙ্গেই হবে।

রুনু খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। মনজুর শরীর ঝিমঝিম করছে। মাথা সামান্য দুলছে। তার মনে হচ্ছে— সে যা দেখছে সেটা স্বপ্ন। সে আসলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন সে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নের ফাজলামি। স্বপ্ন তাকে নিয়ে ফাজলামি করছে।

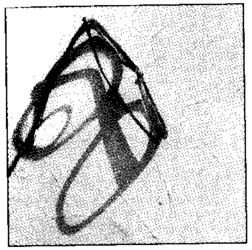

বিশ দিন পর শুভ্র'র ঘরে মনজুর ডাক পড়ল। সকাল আটটা মাত্র বাজে। মনজু নাশতা শেষ করে চা খেতে বাড়ির সামনের চায়ের দোকানে বসেছে। কড়া করে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দিনের প্রথম সিগারেট ধরিয়েছে। এমন সময় রহমতউল্লাহ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, ছোট সাহেব ডাকেন।

মনজু হাই তুলতে তুলতে বলল, ঠিক আছে।

রহমতউল্লাহ বললেন, ঠিক আছে মানে ? তাড়াতাড়ি যাও।

মনজু বলল, চা-টা খেয়ে যাই।

রহমতউল্লাহ বিস্মিত গলায় বললেন, তোমার ডাক পড়েছে, তুমি এক্ষণ ছুটে যাবে। আয়েশ করে চা খাওয়া আবার কী ?

মনজু রহমতউল্লাহর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মোটামুটি আয়েশ করেই চা'য়ে চুমুক দিল।

রহমতউল্লাহ বললেন, ব্যাপারটা কী তোমার ? তুমি কি এইখানে চাকরি করতে চাও না ? মাঝখানে এক রাত কোথায় কাটায়ে এসেছ। তোমার ভাগ্য ভালো, আমি রিপোর্ট করি নাই। এখন আবার নবাবী চালে চা খাচ্ছ।

মনজু বলল, আমি ঠিক করেছি ছাতার চাকরি করব না।

চাকরি করবে না ?

না। চাকরের চাকরি আমার পোষাবে না।

ছোটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবে না ?

দেখা করলেও করতে পারি। চাচাজি, আপনি চা খাবেন ? এরা চা ভালো বানায়। খান এক কাপ। পয়সা আমি দেব।

রহমতউল্লাহ রাগী চোখে তাকিয়ে থাকলেন। মনজু প্রথম কাপ চা শেষ করে দ্বিতীয় কাপ নিল। আরেকটা সিগারেট ধরাল। দিনের প্রথম চায়ের সঙ্গে পর পর দু'টা সিগারেট খেতে হয়। মামা-ভাগ্নে সিগারেট।

রহমতউল্লাহ বললেন, মনজু, তুমি চাকরি কর বা না কর ছোটসাহেব ডেকেছেন দেখা করে আস।

মনজু বলল, যাচ্ছি। সিগারেট শেষ করেই যাচ্ছি। আপনি এত অস্থির হবেন না। অস্থির হবার কিছু নাই।

রহমতউল্লাহ বললেন, তোমার সমস্যাটা কী?

মনজু বলল, আমার কোনোই সমস্যা নাই। সমস্যা আপনার। খাবেন এক কাপ চা? দিতে বলব?

শুভ্র কালো রঙের প্যান্টের সঙ্গে ধবধবে সাদা সার্ট পরেছে। তাকে দেখাচ্ছে শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো। শ্বেতপাথরের মূর্তির চুল বাতাসে উড়ে না। সে ফ্যানের নিচে বসে আছে বলে তার মাথার চুল উড়ছে। শুভ্র মনজুকে দেখেই হাসিমুখে বলল, Hello young man and the tree.

মনজু কিছু বলল না। সে অদ্ভুত রূপবান যুবকের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। হুট করে তার মাথায় অদ্ভুত একটা চিন্তা চলে এলো। ইস, সে যদি রুনুকে শুভ্র ভাইজানের সামনে দাঁড়া করাতে পারত! রুনু কী বলত তাকে দেখে?

শুভ্র বলল, বুড়োমানুষ দেখলেই আমার মাথায় সমুদ্রের ইমেজ চলে আসে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে 'Old man and the sea' উপন্যাসটি লিখে এই কাণ্ডটা করেছেন। তাঁর উপন্যাসটা পড়ার পর পরই আমার ইচ্ছা করল আমি একটা উপন্যাস লিখি যার নাম 'Young man and the tree'. শেষপর্যন্ত অবশ্যি লেখা হয় নি। তুমি হেমিংওয়ের বই পড়েছ?

জি-না।

উনার নাম শুনেছ?

জি-না। ভাইজান, আমি ইংরেজি তেমন জানি না।

তাতে অসুবিধা নেই, হেমিংওয়ের বইয়ের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।

ভাইজান, আমার বই পড়তে ভালো লাগে না।

ভালো বই কখনো পড় নি বলে ভালো লাগে না। ভালো বই পড়ে দেখতে হবে। মানুষ খুবই উন্নত প্রাণী। ভালো জিনিস যাতে তার ভালো লাগে প্রকৃতি সেই ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সব মানুষ একরকম না। কেউ আপনার মতো, আবার কেউ আমার মতো।

শুভ্র বলল, আচ্ছা থাক, পরে এই নিয়ে কথা বলব। তুমি কেমন আছ?

ভাইজান, আমি ভালো আছি।

কফি খাবে? এক্সপ্রেসো কফি— প্রচুর ফেনা। অতিরিক্ত মিষ্টি।

বিস্মিত মনজু বলল, জি ভাইজান খাব।

শুভ্র বলল, তুমি চেয়ারটায় বসো। তাকিয়ে দেখ আমি কীভাবে কফি বানাই।

মনজু বলল, ভাইজান এর মধ্যেও কি কোনো ম্যাজিক আছে?

শুভ্র বলল, পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই ম্যাজিক আছে। এই যে তুমি চেয়ারটায় বসেছ এর মধ্যেও আছে। ম্যাজিক অব গ্রাভিটেশন। মধ্যাকর্ষণের ম্যাজিক। মধ্যাকর্ষণ কে বের করেছিলেন জানো?

জি-না।

স্যার আইজ্যাক নিউটন। পদার্থবিদ্যার সুপার জায়েন্ট। কী পরিমাণ মেধা যে এই মানুষটা নিয়ে এসেছিল...

শুভ্র কথা বলতে বলতে এক্সপ্রেসো মেশিনে কফি বানাচ্ছে। তার দু'টি চোখ বন্ধ। মনজু অবাক হয়ে ভাবছে— এইটাই কি ম্যাজিক? চোখ বন্ধ করে কফি বানানো? চোখ বন্ধ করে কফি বানাতে এই মানুষটার কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে না। দু' মগ ভর্তি কফি নিয়ে চোখ বন্ধ করেই সে ফিরে আসছে। মনজুর দিকে কফির মগ এগিয়ে দিয়ে শুভ্র চোখ খুলল।

হালকা গলায় বলল, কফি বানানোর ম্যাজিক কেমন দেখলে? অন্ধ হয়ে যাবার পর আমার যেন কোনো অসুবিধা না হয়— তার ব্যবস্থা।

মনজু অবাক হয়ে বলল, অন্ধ হবেন কেন ভাইজান?

শুভ্র কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমার অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো একদিন দরবারের সব আলো নিভে যাবে।

মনজু অবাক হয়ে বলল, ভাইজান, এইসব কী বলেন?

শুভ্র সহজ ভঙ্গিতে বলল, এখন যে আমি দেখতে পারছি, this is important. চল যাই। আজ সারাদিন ঘুরব।

মনজু বলল, কোথায় যাবেন ভাইজান?

শুভ্র বলল, আমি ঠিক করেছি এখন প্রতিদিন তোমাকে নিয়ে বের হব। সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখব। মেমোরি সেলে জমা করে রাখব। অন্ধ হয়ে যাবার পর যেন স্মৃতি থেকে দেখতে পারি। স্মৃতির জাবর। তুমিই বলো কোথায় যাওয়া যায়?

ভাইজান, বুড়িগঙ্গায় যাবেন?

যাওয়া যায়। বুড়িগঙ্গার মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে ঘসেটি বেগমকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ঠিক কোনখানে নৌকাডুবি হয়েছিল সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলে ভালো হতো।

ঘসেটি বেগম কে?

নবাব সিরাজদ্দৌলার খালা। সিরাজদৌলাকে চেন তো?

জি চিনি। উনার ছবিও দেখেছি। আনোয়ার হোসেন সাহেব অভিনয় করেছিলেন। ভাইজান, ছবিটা আপনি দেখেছিলেন ? খুবই মারাত্মক।

না, আমি ছবিটা দেখি নি। অনেক কিছু তুমি জানো যা আমি জানি না, আবার অনেক কিছু আমি জানি যা তুমি জানো না। তাহলে কী ঠিক করা হলো ? আমরা বুড়িগঙ্গায় যাচ্ছি।

আপনে যেখানে বলবেন সেখানে যাব।

বুড়িগঙ্গাই ভালো। মনজু, নদীটার নাম বুড়িগঙ্গা কেন হলো ? যুবতীগঙ্গা কেন হলো না ?

জানি না ভাইজান। আমার বুদ্ধি খুবই কম।

কে বলেছে তোমার বুদ্ধি কম ?

আমার দূরসম্পর্কের একজন বোন আছে, রুনু নাম। এইবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে। সে বলেছে।

তার কি খুব বুদ্ধি ?

জি।

কীভাবে বুঝলে তার খুব বুদ্ধি ?

মনজু আগ্রহ নিয়ে বলল, কেউ মিথ্যা কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। আমি যতবার তার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি, ততবারই ধরে ফেলেছে।

মেয়েটার নাম রুনু, তাই না ?

জি ভাইজান।

মেয়েটাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো। বুদ্ধি পরীক্ষা করার কিছু টেস্ট আছে। আমি পরীক্ষা করে বলে দেব তার আইকিউ কত।

জি ভাইজান, আমি নিয়ে আসব।

গাড়িতে উঠেই শুভ্র বলল, ড্রাইভার সাহেব, আপনার সঙ্গে যে মোবাইল টেলিফোন আছে সেটা বন্ধ করে দিন। মা একটু পর পর খোঁজ করবে আমি কোথায় আছি কী করছি— আমি সেটা চাচ্ছি না।

ড্রাইভার বলল, মোবাইল অফ করলে ম্যাডাম খুব রাগ করবেন।

শুভ্র বলল, রাগ সামলানোর ব্যবস্থা করা যাবে। মোবাইল বন্ধ থাকুক।

ড্রাইভার অপ্রসন্ন মুখে মোবাইল অফ করল। শুভ্র ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, ড্রাইভার সাহেব, মুখ ভোঁতা করে রাখবেন না। মুখ ভোঁতা করার মতো কিছু হয় নি।

ড্রাইভার শুকনা গলায় বলল, জি আচ্ছা।

শুভ্র মনজুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার বোনকে আমাদের সঙ্গে উঠিয়ে নিলে কেমন হয় ? সুন্দর সুন্দর দৃশ্য একা বা দোকা দেখা যায় না। তিনজন লাগে। Three is company.

মনজু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ভাইজান এইসব কী বলছে ?

শুভ্র বলল, রুনু কি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হবে ? তোমার কথায় রাজি না হলে আমি অনুরোধ করে দেখতে পারি। রুনু থাকে কোথায় ?

মনজু বিড়বিড় করে বলল, যাত্রাবাড়িতে।

শুভ্র ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, আগে যাত্রাবাড়িতে চলুন। সেখান থেকে আমরা যাব বুড়িগঙ্গায়।

মোতাহার হোসেনের নির্দেশ আছে— অতি জরুরি কোনো পরিস্থিতি তৈরি না হলে বাড়ি থেকে কখনো তাকে টেলিফোন করা যাবে না। অফিস এবং বাড়ি হলো তেল ও জল। যখন তিনি তেলে থাকবেন তখন তেলেই থাকতে চান। ঝাঁকুনি দিয়ে তেল-জল মেশানোর পক্ষে তিনি কখনো না।

জাহানারা যখন টেলিফোনে আতঙ্কিত গলায় জানালেন, শুভ্র সকাল দশটা এগারো মিনিটে মজনু না-কি ফজনু নামের ছেলেটাকে নিয়ে বের হয়েছে তখন মোতাহার হোসেন গম্ভীর গলায় বললেন, এটা কি অতি জরুরি কোনো খবর ?

জাহানারা বললেন, অবশ্যই জরুরি। এরপর থেকে ওরা কোথায় আমি ট্রেস করতে পারছি না। ড্রাইভার হারামজাদা মোবাইল অফ করে রেখেছে। ওকে আমি বলে রেখেছি শুভ্রকে নিয়ে যখনই বের হবে মোবাইল খোলা রাখবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, আমার ধারণা শুভ্রই বন্ধ রাখতে বলেছে।

শুভ্র কেন বন্ধ রাখতে বলবে ?

তোমার অশরীরী উপস্থিতি হয়তো তার পছন্দ না। তুমি টেনশান করো না।

আমি টেনশান করব না ? ঢাকা শহরে রোজ কয়টা রোড এক্সিডেন্ট হয় তুমি জানো ?

না জানি না।

ইররেসপনসিবল একটা ড্রাইভার! ও নির্ঘাৎ কোনো ট্রাকের সঙ্গে গাড়ি লাগিয়ে দেবে। অটোমেটিক গাড়ি, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে দরজা-জানালা লক হয়ে যাবে। দরজা না কেটে শুভ্রকে বের করা যাবে না।

কী বলছ এসব ?

জাহানারা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমি কাল রাতে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। এই জন্যেই এত টেনশন করছি।

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন তো তুমি প্রতিরাতেই দেখ।

কাল রাতের মতো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কম দেখি। কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখেছি শোন। স্বপ্ন বলা ঠিক না, তারপরেও বলছি।

মোতাহার হোসেন বললেন, বাসায় এসে শুনব। টেলিফোনে স্বপ্ন শুনে মজা পাওয়া যায় না।

জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নের আবার মজা কী! কাল রাতে স্বপ্নে আমি প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের হাতি দেখেছি।

হাতি কি তোমাকে কিছু করেছে ?

না, কিছু করে নি। হাতির গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টা বাজিয়ে হাতি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

এটা তো তেমন দুঃস্বপ্ন বলে আমার মনে হচ্ছে না।

তুমি এই বিষয়ে কিছু জানো না বলে এরকম বলতে পারলে। সাদা হাতি দেখা ভালো। সাদা হাতি দেখলে ধন লাভ হয়। কালো হাতি দেখার মানে অতি প্রিয়জনের মৃত্যু।

মোতাহার হোসেন হতাশ গলায় বললেন, মৃত্যু ঠেকানোর উপায় কী ?

জাহানারা বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমি তালতলার পীর সাহেবের কাছে যাব। উনার দোয়া নেব।

বেশ তো যাও।

তুমি উনার কাছে খবর পাঠাও যে আজ আমি যাব। উনি সপ্তাহে দু'দিন হুজরাখানায় বসেন। তখন কেউ তাকে ডিসটার্ব করতে পারে না। আজ হলো সেই দু'দিনের একদিন। আগে খবর না দেয়া থাকলে উনি হুজরাখানায় বসে পড়বেন।

খবর পাঠাচ্ছি।

দ্বীপ কি কেনা হয়েছে ?

'দ্বীপ কেনা হয়েছে' মানে কী ?

জাহানারা হতাশ গলায় বললেন, তোমাকে বললাম না ছোট্ট একটা দ্বীপ কিনে দিতে ? আমার কোনো একটা কথাও কি তুমি মন দিয়ে শোন না ?

মোতাহার হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছ কেন ?

জাহানারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, কাঁদব না তো কী করব ? আনন্দে নাচব ? খুব ভালো কথা— নাচব। অফিস ছুটি দিয়ে বাড়িতে চলে এসো, স্ত্রীর নাচ দেখে যাও। চাও দেখতে ?

মোতাহার হোসেন টেলিফোন রেখে সুলেমানকে ডেকে পাঠালেন। পৃথিবীর সমস্ত ধনবান ব্যক্তিদের একজন ম্যাজিক পারসন থাকে। যে-কোনো জটিল কাজ এরা করতে পারে। কীভাবে তারা করে সেই বিষয়টি কখনো ব্যাখ্যা করে না।

মোতাহার হোসেনের টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে সুলেমান দাঁড়িয়ে আছে। রোগা লম্বা একজন মানুষ। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মাথার চুল এবং গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি সবই পাকা, অথচ বয়স এখনো পঞ্চাশ হয় নি। চেহারা বিশেষত্বহীন। এই চেহারা একবার দেখলে দ্বিতীয়বার আর মনে থাকে না।

কেমন আছ সুলেমান ?

স্যার ভালো আছি। আপনার দোয়া।

মোতাহার হোসেন বললেন, দোয়া তো আমি কারো জন্যে করি না।

সুলেমান বলল, এই যে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন— কেমন আছ সুলেমান। এতেই দোয়া হয়েছে।

মোতাহার হোসেন বললেন, তালতলার পীর সাহেবের কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে। আজ সন্ধ্যায় শুভ্র'র মা উনার কাছে যাবেন। উনার দোয়া নেবেন।

জি আচ্ছা।

সুলেমান চলে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে জটিল কোনো কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বড় সাহেব জটিল কোনো কাজের আগে একটা অতি সহজ কাজ দেন। একেকজন মানুষের কর্মপদ্ধতি একেক রকম। বড় সাহেব চট করে জটিল কাজে যান না। সুলেমান বলল, স্যার, আর কোনো কাজ আছে ?

মোতাহার হোসেন বললেন, আমি বঙ্গোপসাগরে ছোট্ট একটা দ্বীপ কিনতে চাই। এটা কি সম্ভব ?

সুলেমান বলল, কেনা সম্ভব না। সরকারি খাস জমি বিক্রি হয় না। তবে নিরানব্বই বছরের জন্যে লীজ নিতে পারেন। লীজ নেওয়া কেনার মতোই।

মোতাহার হোসেন বললেন, নিরানব্বই বছরের জন্যে কেন ? একশ' বছর না কেন ?

সুলেমান বলল, খাস জমি একশ' বছরের জন্যে লীজ হয় না। ওদের কী একটা হিসাব আছে আমি জানি না। আপনি যদি জানতে চান আমি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে খোঁজ নিয়ে জানাতে পারি।

জানতে চাচ্ছি না।

সুলেমান বলল, স্যার, আমি কি চলে যাব ?

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। টেবিলে রাখা ফাইলের দিকে চোখ ফেরালেন। এর অর্থ হলো— তোমার সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে, তুমি চলে যেতে পার।

জাহানারা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। তার মাথা দপদপ করছে। সকিনা কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। জলপট্টি বদলে দেয়া ছাড়াও তাকে আরেকটি কাজ করতে হচ্ছে— প্রতি দশ মিনিট পর পর মোবাইল টেলিফোনে শুভ্র'র ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। চেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছে না। টেলিফোন বন্ধ।

জাহানারার মাথার দপদপানি মাইগ্রেনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। এখন চোখ জ্বলুনি শুরু হয়েছে। মাইগ্রেনের ব্যথা শুরুর এটা হলো পূর্বলক্ষণ। যদি সত্যি সত্যি ব্যথা উঠে যায় তাহলে তালতলার হুজুরের কাছে যাওয়া যাবে না। খবর দিয়ে না যাওয়া বিরাট বেয়াদবি হবে। জাহানারা অস্থির বোধ করছেন।

সকিনা বলল, মা, আপনি কি মাথার যন্ত্রণার অন্য একটা চিকিৎসা করবেন ?

জাহানারা বললেন, অন্য কী চিকিৎসা ?

সকিনা বলল, আমাদের গ্রামে অচিনবৃক্ষ বলে একটা বৃক্ষ আছে। বর্ষাকালে সেই বৃক্ষে ফুল ফুটে। তখন যদি কেউ সেই গাছে হাত রেখে কিছু চায় তাহলে সে সেটা পায়।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব আজগুবি কথা আমাকে শুনাবে না। গাছের কাছে চাইলেই গাছ দিয়ে দেবে। গাছ কি পীর সাহেব না-কি ?

সকিনা বলল, বহুকাল আগে এক সাধু কুমিরের পিঠে চড়ে আমাদের অঞ্চলে এসেছিলেন। উনি নিজের হাতে এই গাছ লাগিয়েছিলেন।

জাহানারা বললেন, তোমাকে না বললাম আজগুবি গল্প বন্ধ করতে। কুমিরের পিঠে চড়ে তাকে আসতে হলো কেন ? তখন কি দেশে নৌকা ছিল না ?

সকিনা বলল, শুভ্র ভাইজান তো গাছ দেখতে যাবেন— তখন আপনি যদি যান।

জাহানারা বিছানা থেকে উঠে বসতে বসতে বললেন, শুভ্র গাছ দেখতে যাবে মানে কী ?

সকিনা বলল, উনি বলেছেন যাবেন। এই বর্ষার মধ্যেই যাবেন।

শুভ্রকে গাছের হাবিজাবি কথা তুমি বলেছ ? কখন বলেছ ? খাতিরের এত আলাপ করার সময়টা বলো।

সকিনা চুপ করে গেল। জাহানারা বললেন, তুমি তলে তলে অনেকদূর চলে গেছ। সুড়ঙ্গ কেটে যাওয়া। এখন বলো, শুভ্র কি কখনো তোমার ঘরে গিয়েছে ?

সকিনা বলল, উনি আমার ঘরে কেন যাবেন ?

জাহানারা বললেন, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে দিবে না। ও তোমার ঘরে গিয়েছে, না-কি যায় নি ?

জাহানারার চোখ চকচক করছে। ঠোঁট কালো হয়ে আসছে। সকিনা ভীত গলায় বলল, মা, আপনি খুব ভালো করে জানেন ভাইজান এরকম মানুষ না।

জাহানারা চাপা গলায় বললেন, শোন সকিনা, মাকাল ফলের ভেতর পোকা হয় না। পোকা হয় সবচে' ভালো যে ফল তার মধ্যে— আমের মধ্যে। বুঝেছ ? শুভ্র মাকাল ফল না।

সকিনা বলল, মা আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার শরীর কাঁপছে।

জাহানারা বললেন, অচিনবৃক্ষের কথা শুভ্র'র সঙ্গে কখন হয়েছে সেটা বলো। কখন হয়েছে ? কোথায় হয়েছে ?

উনার ঘরে। সন্ধ্যাবেলায়।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, কথা বলার সময় তুমি কি ইচ্ছা করে শাড়ির আঁচল ফেলে দিয়েছ বুক দেখানোর জন্যে ? চুপ করে থাকবে না— বলো। আমার ছেলেকে ভুলানোর জন্যে কী কী কৌশল করেছ সেটা বলো। বুক দেখানো ছাড়া আর কী করেছ ?

মা, কেন এরকম করছেন ?

চুপ থাক মাগি! মা ডাকবি না। তুই এক্ষুণি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবি।

সকিনা বলল, ঠিক আছে মা— চলে যাব।

চলে যাব বলেও বসে আছিস কেন ?

সকিনা উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বের হলো। জাহানারা কাঁদতে শুরু করলেন।

রুনু অবাক হয়ে শুভ্রকে দেখছে। একটি যুবক ছেলের দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকা যায় না। অস্বস্তি লাগে। রুনুর অস্বস্তি লাগছে না। বরং তার মনে হচ্ছে এইভাবে তাকিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। রুনু বের করার চেষ্টা করছে কেন তার অস্বস্তি লাগছে না। তার ধারণা তার অস্বস্তি লাগছে না কারণ যার দিকে সে তাকিয়ে আছে তার অস্বস্তি লাগছে না। একজন পাগলের দিকে একদৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকা যায়, কারণ পাগল তাতে কিছু মনে করে না। বাচ্চা একটা ছেলের দিকেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা যায়।

রুনু বসে আছে ইঞ্জিন বসানো ছোট্ট একটা নৌকার পাটাতনে। পাটাতনে শীতলপাটি বিছানো। শুভ্র পা ছড়িয়ে হাতে ভর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে আধশোয়া হয়ে আছে। তার দৃষ্টি স্থির না। সে সব কিছুর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে হাসিমুখে তাকাচ্ছে রুনুর দিকে। মনজু বসেছে মাঝির কাছে। নৌকায় অল্প অল্প পানি উঠছে। মনজু অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে সেই পানি তুলে নদীতে ফেলছে।

শুভ্র রুনুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যে পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছ তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন বলো— তোমার কি ভালো লাগছে ?

রুনু বলল, ভালো লাগছে।

শুভ্র আধশোয়া অবস্থা থেকে বসতে বসতে বলল, কোন জিনিসটা ভালো লাগছে বলো তো। স্পেসিফিক্যালি বলো।

রুনু কী বলবে বুঝতে পারছে না। এই অদ্ভুত সুন্দর ছেলেমানুষ ধরনের যুবক তার কাছে কী শুনতে চাচ্ছে ? সে যা শুনতে চায় রুনু তাকে তাই বলবে।

শুভ্র বলল, চুপ করে আছ কেন বলো ? এখানে ভালো লাগার অনেকগুলি এলিমেন্ট আছে। একটা হচ্ছে নদী, একটা হচ্ছে আকাশ, একটা হচ্ছে নদীর নানান কর্মকাণ্ড...।

রুনু বলল, সবকিছু মিলিয়েই আমার ভালো লাগছে।

শুভ্র বলল, তোমার কি এরকম মনে হচ্ছে যে সবচে' ভালো হয় যদি আর বাড়িতে ফিরে না যাওয়া যেত ? নৌকা চলছে তো চলছেই। আমরা নৌকার সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি।

রুনু সামান্য চমকালো। নৌকায় উঠার পর থেকেই তার এরকম মনে হচ্ছে। শুভ্র বলল, বাড়ি থেকে বের হলে আমার আর বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা করে না। দশ-এগারো বছর বয়সে আমি একবার বাড়ি থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

রুনু ক্ষীণ গলায় বলল, কেন ?

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, মনের দুঃখে। আমার একটা পোষা কাক ছিল। কাকটা রোজ আসত আমার কাছে। হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল। খুব কষ্ট লাগল। আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম কাকটাকে খুঁজে বের করতে।

পোষা কাক মানে ?

কাকটা পোষ মেনেছিল। আমি তার নাম দিয়েছিলাম কিংকর।

কাকটাকে পেয়েছিলেন ?

না। আমি সকালবেলা বের হয়েছিলাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজলাম।

কীভাবে খুঁজলেন ?

যেখানে কাক দেখতাম দাঁড়িয়ে পড়তাম। আমার ধারণা ছিল আমি কাকটাকে চিনতে না পারলেও সে আমাকে চিনবে। আমাকে দেখলেই উড়ে আসবে আমার কাছে।

আপনি কী করলেন ? সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এলেন ?

না। তোমাকে বলেছি না একবার বাড়ি থেকে বের হলে আমার আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। আমি ফিরলাম তিনদিন পরে। ফিরলাম বলা ঠিক হবে না। পুলিশ তিনদিন পর আমাকে মুন্সিগঞ্জ থেকে উদ্ধার করল। আমাকে উদ্ধারের জন্যে বাবা এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আমার মা এই তিনদিন পানি ছাড়া কিছু খান নি। ঐ ঘটনার পর আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। প্রাইভেট মাস্টাররা বাড়িতে এসে আমাকে পড়াত।

রুনু বলল, আপনাকে উদ্ধারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার কে পেয়েছিল ?

শুভ্র বলল, আমি জানি না কে পেয়েছিল। আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

আপনাকে জানতে হবে না।

অবশ্যই জানতে হবে। একটা বিষয়ে তোমার কৌতূহল হয়েছে, তুমি সেটা জানবে না ?

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। এক পাশে সূর্য এখনো দেখা যাচ্ছে কিন্তু সূর্যে তাপ নেই। মনজু চিন্তিত মুখে আকাশ দেখছে। সে বলল, ভাইজান, এখন ফিরি ? বৃষ্টি নামবে।

শুভ্র বলল, নামুক। বৃষ্টি নামলে বৃষ্টিতে ভিজব। রুনু, তোমার বৃষ্টিতে ভিজতে আপত্তি আছে ?

রুনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, না।

শুভ্র লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টি এখন আকাশে। মেঘের উপর মেঘ জমার দৃশ্যটা যে এত সুন্দর তা সে আগে লক্ষ করে নি। আজ রাতে আত্রলিতাকে এই দৃশ্যের কথা জানাতে হবে। কীভাবে লিখবে এটা গুছিয়ে ফেললে কেমন হয়?

> আত্রলিতা! আজ কিছুক্ষণের জন্যে নৌকাভ্রমণ করেছি। আমি নৌকার পাটাতনে শুয়েছিলাম। নৌকা দুলছিল। নৌকার দুলুনির সঙ্গে আশেপাশের সব দৃশ্য দুলছে। শুধু দুলছে না মাথার উপরের ঘন কালো মেঘ। প্রকৃতির একটি অংশ দুলছে, আরেকটি অংশ স্থির। খুবই অদ্ভুত।

রুনুর কেমন জানি লাগছে। এক ধরনের অস্বস্তি, এক ধরনের কষ্ট। মানুষটা এতক্ষণ তার সঙ্গে কত কথা বলছিল, এখন কেমন ঘোরলাগা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন সে চোখের সামনে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

মানুষটা শুয়ে আছে নৌকার পাটাতনে। শোয়ার ভঙ্গিটাও কী সুন্দর। এত মন দিয়ে দেখার মতো কী আছে আকাশে? রুনুর এখন খুব একটা বাজে ইচ্ছা হচ্ছে। তার ইচ্ছা করছে মানুষটার পাশে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে। সে নিশ্চয়ই খুব খারাপ একটা মেয়ে। এরকম চিন্তা খারাপ মেয়ে ছাড়া কারোর মাথায় আসবে না। সে অবশ্যই খারাপ মেয়ে। ভয়ঙ্কর খারাপ মেয়ে।

রুনুর কান্না পাচ্ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কান্না আটকে রাখতে। কতক্ষণ পারবে কে জানে! মনজু ভাই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে যদি কাঁদতে শুরু করে তাহলে মনজু ভাই কী ভাববেন কে জানে!

শুভ্র হঠাৎ রুনুর দিকে তাকিয়ে বলল, রুনু, একটা কাজ কর। আমি যেভাবে শুয়ে আছি ঠিক এইভাবে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাও। অদ্ভুত একটা ফিলিং হবে। মনে হবে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ভাসছ।

রুনু সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। সে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। কিন্তু সে মেঘ দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তার চোখ ভর্তি জল। আকাশের কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে তার কাঁদতে ভালো লাগছে।

তালতলার পীর সাহেবের নাম কামাল উদ্দিন কাশেমপুরী। পীর সাহেব ছোটখাটো মানুষ। গলার স্বর মধুর। তিনি সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলেন। তাঁর ছোট ভাই জামাল উদ্দিন কাশেমপুরীও পীর ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ। মুরিদানদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ছিল খারাপ। এমনও শোনা যায় তিনি কোনো মুরিদানের উপর রাগ করে লাথি মেরেছেন। দুই ভাই দুই তরিকার পীর। একজন

গরম পীর, একজন নরম পীর। বছর ছয়েক আগে ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মুরিদানরা বড় ভাইয়ের কাছে ছুটে এসেছে। বড় ভাই হাসিমুখে বলেছেন, বাবারা, তোমরা আমার কাছে এসো না। আমার ভাইয়ের পথ আর আমার পথ এক না। এক পুকুরেই আমরা অজু করি। কিন্তু আমাদের ঘাট ভিন্ন।

জাহানারা পীর সাহেবের সামনে ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। পীর সাহেব বললেন, মাগো, বাম হাতটা একটু বাড়ান।

জাহানারা হাত বাড়ালেন। পীর সাহেব জাহানারার হাতে আতর মাখিয়ে দিলেন। জাহানারা বললেন, বাবা আমার জন্যে দোয়া করবেন, আমি খুবই কষ্টে আছি।

পীর সাহেব বললেন, কেউ যখন আমাকে বলে 'আমি কষ্টে আছি' তখন বড় আনন্দ হয় গো মা। কারণ আল্লাহপাক তাঁর পিয়ারাবান্দাদের কষ্টে রাখেন। তিনি যাদের উপর নাখোশ তারাই ইহকালে সুখে থাকে। আপনার মাথাব্যথা রোগের কি কিছু আরাম হয়েছে?

জি-না।

চোখে সুরমা দিবেন। সুরমা দিয়ে জায়নামাজে বসে বলবেন— 'হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে রোগ দিয়েছ। এই রোগ নিয়াও আমি সবুর করলাম। এই রোগই আমার বান্ধব।' খাস দিলে এটা বলতে পারলে আল্লাহপাক রোগ তুলে নিবেন।

জাহানারা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি খাস দিলে কিছুই বলতে পারি না বাবা। আমার মন সবসময় অস্থির থাকে। ছেলে সকালবেলা বের হয়েছে, এখনো ফিরে নাই। কোথায় গিয়েছে কিছুই জানি না। ড্রাইভার বদমাশটা মোবাইল টেলিফোন বন্ধ করে রেখেছে।

পীর সাহেব কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখলেন। তারপর চোখ মেলে বললেন, ছেলে বাড়িতে ফিরেছে গো মা। টেলিফোন করে দেখেন। আর যদি নাও ফিরে— কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে। ধ্যানে পেয়েছি।

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করলেন। টেলিফোন ধরল সকিনা। সে জানাল, শুভ্র ভাইজান কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে। তার সারা শরীর ভেজা। চোখ লাল। মনে হয় জ্বর এসেছে।

জাহানারা বললেন, ডাক্তার খবর দিয়েছ?

সকিনা বলল, দিয়েছি মা।

জাহানারা বললেন, ওর জ্বর কত থার্মোমিটার দিয়ে এক্ষুণি আমাকে জানাও। আমার ফিরতে দেরি হবে, আমি পীর সাহেবের কাছে আছি।

জি আচ্ছা।

তোমাকে তো আমি চলে যেতে বলেছিলাম, তুমি চলে যাও নি কেন ?

কাল সকালে যাব মা।

অবশ্যই সকালে বিদায় হবে। আমি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যেন তোমাকে দেখতে না পাই।... আমি টেলিফোন ধরে আছি। তুমি শুভ্র'র জ্বর কত সেটা থার্মোমিটারে দেখে আমাকে জানাও।

জি আচ্ছা।

আর ড্রাইভার হারামজাদাটাকে জেগে থাকতে বলবে, তার সঙ্গে আমার কথা আছে।

জি আচ্ছা।

সকিনা জ্বর দেখে ভীত গলায় বলল, ভাইজানের জ্বর অনেক বেশি মা। একশ' তিন।

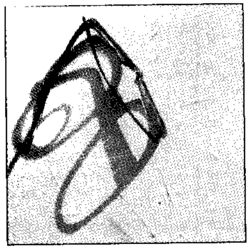

'ভালুক জ্বর' বলে একটা কথা আছে। হঠাৎ হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই সারা শরীর কাঁপিয়ে ভালুকের জ্বর আসে। সে কুকড়ি-মুকড়ি হয়ে পড়ে থাকে। জ্বরের তড়াসে তার শরীর কাঁপতে থাকে। দেখতে দেখতে হুট করে জ্বর চলে যায়। সে গা ঝাড়া দিয়ে দু'পায়ে উঠে দাঁড়ায়।

শুভ্র'র জ্বর সম্ভবত ভালুকগোত্রীয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে বিছানায় উঠে বসল। খুশি খুশি গলায় সকিনাকে ডেকে চা দিতে বলল। তার কাছে মনে হচ্ছে জ্বর এসে চলে যাওয়ায় ভালো হয়েছে। মাথাটা পরিষ্কার লাগছে। এখন ঠাণ্ডা মাথায় সফটওয়্যারটা নিয়ে বসা যায়। যুক্তাক্ষরের সমস্যাটার সমাধান করা যায়। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত রাখতে পারলে ভালো হতো। সে শব্দ শুনে বলতে পারত কোন শব্দটা কানে শুনতে ভালো লাগে। রুনু মেয়েটাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। সেটা তো সম্ভব না।

জাহানারা বাড়িতে ফিরে দেখেন, শুভ্র কম্পিউটারের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। কী-বোর্ডে চাপ দিচ্ছে। পোঁ পি শব্দ হচ্ছে। শুভ্র শব্দ শুনছে চোখ বন্ধ করে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এই তোর না জ্বর ? শুভ্র হাসিমুখে বলল, জ্বর নেই মা। কপালে হাত দিয়ে দেখ।

জাহানারা ছেলের কপালে হাত দিলেন। আসলেই জ্বর নেই। শরীর ঠাণ্ডা। শুভ্র বলল, তুমিই বলো জ্বর কি আছে ?

জাহানারা বললেন, জ্বর নেই। তবে তোর জ্বর কীভাবে চলে গেছে সেটা শুনলে তুই চমকে উঠবি।

শুভ্র বলল, বলো তো শুনি।

জাহানারা বললেন, তোর জ্বর শোনার পর আমি পীর সাহেবকে বললাম। উনি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দোয়া পড়লেন। তারপর চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তখনি বুঝেছি কাজ হয়েছে। তুই হাসছিস কেন ? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ? তোকে একদিন আমি হুজুরের কাছে নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

আজকের বেড়ানো কেমন হয়েছে ?

খুবই ভালো হয়েছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভিজে দারুন মজা পেয়েছি।

জাহানারা ছেলের কাঁধে হাত রাখতে রাখতে বললেন, এখন থেকে তুই যখন বাইরে কোথাও যাবি— আমি সঙ্গে যাব।

বেশ তো যাবে। আগামীকাল আমি যাব অচিনবৃক্ষ দেখতে। তুমি তোমার ব্যাগ গুছিয়ে নাও। তুমি যাবে, সকিনা মেয়েটিও যাবে। সকিনা পথ-ঘাট দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

জাহানারার মুখ শক্ত হয়ে গেল। ঘাড় ব্যথা করতে লাগল। প্রেসারের লক্ষণ। চট করে প্রেসার বেড়েছে। প্রেসার বাড়লেই তার ঘাড় ব্যথা করতে থাকে। হাতের তালু ঘামে। হাতের তালু ঘামা এখনো শুরু হয় নি, তবে শুরু হবে। আজ ভোরে প্রেসারের ওষুধ খেয়েছেন কি-না তিনি মনে করতে পারলেন না। নাশতা খাবার পর পর প্রেসারের ওষুধ তার হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব সকিনার। সে কি দিয়েছে ?

শুভ্র বলল, কী হয়েছে মা ?

জাহানারা বললেন, কাল যেতে পারবি না। কাল তোর জন্মদিনের উৎসব করব। আমি নিজের হাতে পোলাও রান্না করব।

শুভ্র বলল, কাল আমার জন্মদিন না-কি ?

কাল জন্মদিন না, কিন্তু আমি উৎসবটা কাল করব। সন্ধ্যার পর তোকে আমি পীর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। উনি তোর মাথায় ফুঁ দিয়ে দেবেন।

শুভ্র বলল, একটা খালি বোতল নিয়ে যাও মা। বোতলে করে উনার ফুঁ নিয়ে এসো। তারপর সেই ফুঁ আমার মাথায় ঢেলে দিও।

উনাকে নিয়ে ঠাট্টা ফাজলামি করবি না।

আচ্ছা যাও করব না।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, শুভ্র খপ করে তার হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিল। জাহানারার মন ভারী হয়েছিল, শুভ্র'র এই কাণ্ডে হঠাৎ করে মন ভালো হয়ে গেল। ঘাড়ের ব্যথা কমে গেল।

শুভ্র বলল, তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি। ছোটবেলায় একবার আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে ? তখন আমাকে উদ্ধারের জন্যে এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। তোমার মনে আছে মা ?

জাহানারা বললেন, মনে থাকবে না কেন ?

শুভ্র বলল, ঐ পুরস্কারের টাকাটা কে পেয়েছিল ?

সেটা জেনে কী করবি ?

শুভ্র বলল, রুনুকে খবরটা দিতে হবে। রুনু জানতে চাচ্ছিল।

জাহানারা বিস্মিত হয়ে বললেন, রুনু কে ?

শুভ্র বলল, রুনু হচ্ছে মনজুর বোন। অসম্ভব বুদ্ধিমতি একটা মেয়ে।

জাহানারা বললেন, ওর সঙ্গে দেখা হলো কোথায় ?

শুভ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, ও তো সারাদিন নৌকায় আমাদের সঙ্গেই ছিল। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজলাম।

জাহানারা একদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। রুনু নামের একটা মেয়ে আবার কোত্থেকে উদয় হলো। শুভ্র কি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে ? মা'র সঙ্গে ঠাট্টা করার অভ্যাস অবশ্যি শুভ্র'র আছে।

শুভ্র বলল, মা, তুমি এমন রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন ? মেয়েটাকে দেখলে তোমার ভালো লাগবে। তার গলার স্বর মিষ্টি। ভাইব্রফোনের আওয়াজের সঙ্গে মিল আছে।

জাহানারা বললেন, মেয়েটাকে কে নিয়ে গিয়েছিল, মনজু ?

শুভ্র বলল, না, আমিই মেয়ের মা'কে বলে সঙ্গে নিয়ে গেছি। মা শোন, আমরা কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি— এক লাখ টাকা কে পেয়েছিল ?

আমি জানি না কে পেয়েছিল।

কে জানে ? বাবা জানেন ?

জানি না তোর বাবা জানে কি-না।

শুভ্র বলল, বাবা না জানলেও একজন অবশ্যই জানবে। সুলেমান চাচা। মা, তাঁকে খবর পাঠাও তো।

জাহানারা কঠিন মুখে বললেন, এত রাতে তাকে খবর পাঠানো যাবে না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অস্থির হবার কিছু নাই।

কোনো বিষয়ই তুচ্ছ না মা।

জাহনারা উঠে দাঁড়ালেন। তার ঘাড়ের ব্যথা আবার শুরু হয়েছে। হাতের তালু ঘামছে। তার উচিত ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকা। সেটা সম্ভব না। আগে তাঁকে দু'টা জরুরি কাজ করতে হবে। মনজু নামের বদমাশটাকে বিদায় করতে হবে। সকিনাকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। কাজটা করতে হবে আজ

রাতেই। শুভ্র'র বাবার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে ভালো হতো। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানি কোনো এক কোম্পানির ডিরেক্টরের সঙ্গে আজ তার ডিনার আছে। ফিরতে অনেক রাত হবে।

মনজু বিছানায় শুয়ে আছে। তার হাতে মায়ের চিঠি। চিঠিটা আজ দুপুরে এসেছে। এখনো পড়া হয় নি। মায়ের চিঠি এমন কোনো ব্যাপার না যে বিছানায় শুয়ে আয়েশ করে পড়তে হবে। মনজুর খুবই ক্লান্তি লাগছে— বসে থাকতে পারছে না। আজ সারা দিন তার উপর ভালো ধকল গিয়েছে। রুনুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বড় রকমের ভুল হয়েছে। মেয়েটা ফেরার পথে একটু পরপর চোখ মুছছিল। চোখের পানি ফেলার মতো কোনো ঘটনা তো ঘটে নি। শুভ্র ভাইজান তার স্বভাবমতো রুনুর সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করেছেন। রুনু কি তার অতি ভদ্র ব্যবহারকেই অন্য কিছু ভেবেছে? এত বোকা মেয়ে তো রুনু না।

মনজু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে মা'র চিঠি পড়তে শুরু করল। চিঠি পড়ার আগেই তার মন ভারী হয়ে গেল। দীর্ঘ চিঠিতে আনন্দ পাওয়ার মতো কিছুই থাকবে না। মা'র চিঠি মানেই ধারাবাহিক ঘ্যানঘ্যানানি।

বাবা মনজু,

দোয়া পরসমাচার তোমার পাঠানো টাকা পাইয়াছি। মাত্র চার হাজার টাকা পাঠাইয়াছ কেন বুঝিলাম না। তুমি জানাইয়াছিলে তোমার বেতন ছয় হাজার টাকা। থাকা-খাওয়া ফ্রি। সেই ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিলেই তুমি আরো কিছু পাঠাইতে পারিতে। সংসারের অবস্থা অতি শোচনীয়। বাবা, তুমি যেভাবেই পার প্রয়োজনে ঋণ করিয়া হইলেও দুই একদিনের ভিতর আরো দুই হাজার টাকা পাঠাও। নিতান্তই অপারগ হইয়া তোমাকে জানাইতেছি।

মূল ঘটনা না জানিলে তুমি বিপদের মাত্রা বুঝিতে পারিবে না। তোমার সৎবাবার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। তিনি আবার ভালো সিগারেট ছাড়া খাইতে পারেন না। পুরানা দিনের অভ্যাস। তিনি একটা দোকান থেকে বাকিতে সিগারেট নিতেন। সেখানে একুশ শ' টাকা বাকি পড়িয়া গেল। দোকানদারের এক ভাই আছে মাস্তান। নাম জহিরুল। অঞ্চলে 'হাতকাটা জহিরুল' নামে তার পরিচয়। সকলেই তার ভয়ে অস্থির থাকে। থানায় তার নামে কয়েকটি

মামলা আছে। তারপরও থানাওয়ালারা তাহাকে কিছুই বলে না। উল্টা খাতির করে। চা-সিগ্রেট খাওয়ায়। ঐ বদমায়েশ হাতকাটা জহিরুল অনেক লোকজনের সামনে তোমার সৎবাবার শার্টের কলার চাপিয়া ধরিয়াছে। চড়-থাপ্পড় দিয়াছে। সে তোমার সৎবাবাকে বলিয়াছে— এক সপ্তাহের মধ্যে দোকানের বাকি শোধ না করিলে সে তোমার সৎবাবার বাম হাতের কব্জি কাটিয়া ফেলিবে।

বাবা মনজু, হাতকাটা জহিরুলের পক্ষে সবই সম্ভব। তোমার সৎবাবা ভয়ে দিনরাত এখন ঘরে থাকেন। তাহার রাতে ঘুম হয় না। বাবা, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা তোমাকে যেভাবেই হউক করিতে হইবে।

তোমার বোনের হাতে কিছু টাকা আছে। পরিমাণ কত আমি জানি না। সে এই বিষয়ে কিছুই বলে না। গত মঙ্গলবার চায়ের পাতা কিনিবার জন্যে তাহার নিকট পঞ্চাশটা টাকা চাহিয়াছি। সে বলিল, টাকা নাই। অথচ সেই দিনই সন্ধ্যায় সে জিলাপি কিনিয়া আনিয়া তাহার দুই পুত্রকে খাওয়াইছে। আমার মনে খুবই দুঃখ হইয়াছে। আমি কেমন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছি যে আমার সহিত মিথ্যাচার করে?

আরেক দিনের ঘটনা শুনিলে তুমি অবাক হইবে। তোমার সৎবাবা বাজার হইতে শখ করিয়া একটা কালো বাউস মাছ কিনিয়া আনিয়াছেন। দুপুরে খাইতে তাঁহার বিলম্ব হয়। কারণ তিনি এই সময় স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে পত্রিকা পড়িতে যান। দুপুরের দিকে লাইব্রেরিতে ভিড় থাকে না। সব পত্রিকা হাতের কাছে পাওয়া যায়। উনার ফিরিতে বিলম্ব হইবে জানি বলিয়া আমি একটা বাটিতে কয়েক পিস মাছ তুলিয়া মিটসেফে রাখিয়া গোসল করিতে ঢুকিয়াছি, এই ফাঁকে তোমার ভগ্নি বাটির সবগুলি মাছ তাহার দুই পুত্রকে খাওয়াইয়া দিয়াছে। যে শখ করিয়া মাছ কিনিয়াছে তাহার ভাগ্যে মাছের একটা ভালো পিস জুটে নাই। ইহাকে শত্রুতা ছাড়া আর কী বলা যায়! নিজের পেটের সন্তান যদি শত্রু হয় তখন বুঝিতে হইবে কিয়ামতের আর দেরি নাই।

বাবাগো, সংসারের এইসব বিষয় নিয়া মন খারাপ করিও না। সবই আমার কপাল। এখন তুমি শুধু তোমার সৎবাবাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি জানো না যে তিনি তোমাকে কী পরিমাণ স্নেহ করেন। প্রায়শই তোমার কথা বলেন। বাবাগো, পত্রপাঠ শেষ হইবা মাত্র তুমি মানি অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।

ইতি
তোমার মা

চিঠি পড়তে গিয়ে মনজুর মাথা ধরে গেছে। মাথা ধরা সারানোর উপায় হলো, গরম পানি নিয়ে 'হেভি' গোসল দেয়া। গোসলের পর কড়া এক কাপ চা। সঙ্গে মামা-ভাগ্নে সিগারেট। বাড়িতে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারলে মাথা ধরা সঙ্গে সঙ্গে কমে যেত। এই সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। হাতে টাকা আছে মোট চারশ' এগারো। এক জোড়া জুতা আর একটা হালকা সবুজ রঙের হাফ শার্ট কিনে সে টাকা নষ্ট করেছে। জুতা জোড়া কিনতেই হতো। শার্টটা না কিনলেও চলত। শার্টটা কেনা হয়েছে লোভে পড়ে। শার্টটা এখনো পরা হয় নি। দোকানে নিয়ে গেলে টাকা ফেরত দেবে বলে মনে হয় না। টাকা এমন জিনিস যে হাত থেকে বের হলে আর ফেরত আসে না।

মনজু বালিশের নিচ থেকে সিগারেট ধরাল। খালি পেটে সিগারেট ধরালে মাথা ধরা আরো বাড়বে। বাড়ুক। মাথার যন্ত্রণায় সে ছটফট করুক। মাথা যন্ত্রণা নিয়ে মা'র চিঠির জবাব দিতে পারলে ভালো হতো। মনজু সিগারেটে টান দিয়ে মনে মনে চিঠির জবাব দিতে শুরু করল—

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। সন্ত্রাসী হাতকাটা জহিরুল্লকে আমার অভিনন্দন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। সে যে আমার সৎপিতার বাম হাতের কব্জি কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতে আমি আনন্দিত। বাম হাতের কব্জি না কেটে ডান হাতেরটা কাটা কি সম্ভব ? এই বিষয়ে তুমি তার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পার। আমার ধারণা অনুরোধ করলে সে রাখবে। তোমার অনুরোধ তো সে ফেলবেই না। তোমার মতো মিষ্টি করে অনুরোধ কেউ করতে পারে বলে আমি মনে করি না। একটাই শুধু আফসোস— আমার আসল বাবার সঙ্গে তোমার মিষ্টি গলা কখনো বের কর নি।

মা, তোমার কি মনে আছে বাবা তার কোনো এক বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে গিয়ে দেরি করে ফিরেছিল বলে তুমি তাকে শাস্তি দিয়েছিলে ? পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীতে তুমি দরজা খুলো নি। বেচারাকে সারারাত বাইরে বসে থাকতে হয়েছে। যাই হোক, কী আর করা! প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কপাল নিয়ে আসে। আমার সৎবাবা ভালো কপাল নিয়ে এসেছেন।

মা, উনার কব্জি কাটা নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। প্রতিটি খারাপ জিনিসের মধ্যেও ভালো কিছু থাকে। উনার কব্জি কাটায় নিশ্চয়ই কোনো মঙ্গল নিহিত আছে। আমরা সেটা ধরতে পারছি না।

এই মুহূর্তে আমার যেটা মাথায় আসছে তা হলো— ভিক্ষাবৃত্তিতে সুবিধা। শেষ জীবনে উনাকে যদি ভিক্ষা করে খেতে হয় তাহলে কব্জি কাটা খুবই কাজে আসবে। মানুষের দয়া আকর্ষণের জন্যে কাটা কব্জি কাজে আসবে। রোজ সকালে একটা থালা হাতে তুমি উনাকে মসজিদের পাশে বসিয়ে দিয়ে আসবে। এশার নামাজের পর নিয়ে আসবে। বুদ্ধিটা ভালো না ?

আমার খবর হচ্ছে— আমি ভালো আছি। চাকরিতে অতি দ্রুত একটা প্রমোশন হয়েছে। এখন আমি একটা সেকশানের ইনচার্জ। বেতন সব মিলিয়ে পনের হাজার পাচ্ছি। তারপরেও আমার পক্ষে তোমাদের কোনো টাকা-পয়সা পাঠানো সম্ভব না। কারণ আমি বিয়ে করছি। বিয়ের খরচ তো আমাকে কেউ দিবে না। নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। মেয়ের নাম রুনু। তুমি চিনতেও পার— ইকবাল মামার মেয়ে। বিয়ের পর হানিমুন করতে নেপাল যাব। সেখানেও টাকা দরকার। আগামী এক-দুই বছর একটা টাকাও তোমাদের পাঠাতে পারব না।

আসলে তোমার গর্ভই খারাপ। গর্ভে যেমন বিচ্ছু-মেয়ে ধারণ করেছ, সে-রকম কুলাঙ্গার ছেলেও ধারণ করেছ। কব্জিকাটা মানুষটাকে নিয়ে সুখে দিন কাটাও— এই তোমার প্রতি আমার শুভকামনা।

ইতি
তোমার কুপুত্র মনজু

মনে মনে চিঠিটা লিখে মনজু আরাম পেয়েছে। এরকম আরেকটা চিঠি সৎবাবাকে লিখতে পারলে আরামটা আরো প্রবল হতো। চিঠির শুরু হবে এইভাবে—

ঐ ব্যাটা কল্লিকাটা, ...

শুরুটাতে কবিতার ছন্দের মতো ছন্দ আছে। মিলও আছে। ব্যাটার সঙ্গে কাটার মিল।

চিঠিটা শুরু করা গেল না।

রহমতুল্লাহ এসে ঢুকল। তার পরনে ইস্ত্রি করা পায়জামা-পাঞ্জাবি। চুল আঁচড়ানো। মুখ দিয়ে মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে। আজ তার বিশেষ দিন। মদ্যপান করেছেন। যেদিন এই কাজটা করেন সেদিন তার সাজগোজ ভালো থাকে। মেজাজও ভালো থাকে। তিনি মনজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আছ কেমন ?

মনজু বলল, ভালো।

খাওয়া-দাওয়া করেছ ?

জি-না।

খাওয়া-দাওয়া করে নাও। আজ ভালো খাওয়া আছে। মেজবানির গরুর মাংস। হেড অফিসে রান্না হয়েছে। চিটাগাং থেকে বাবুর্চি এসেছে। মেজবানির মাংস গরম গরম খাওয়া ভালো।

মনজু বলল, আজ কি কোনো উপলক্ষ ?

রহমতুল্লাহ হাই তুলতে তুলতে বললেন, আছে নিশ্চয়ই কিছু। হেড অফিসের সব খবর তো পাই না। আমি পঁচা আদার ব্যাপারি। জাহাজের খবর কী রাখব ? হেড অফিস হলো জাহাজ। এইটাই ভাবতেছিলাম— আমাদের বড় সাহেব ঢাকা শহরে এসেছিলেন এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে। তার কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগে ছিল একটা লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি। সঙ্গে ছিল ক্যাশ আটশ' পঁচিশ টাকা। টাকাটা এনেছিলেন মায়ের গলার চেইন বিক্রি করে। আর দেখ আজ তার অবস্থা। শুনেছি বড় সাহেব না-কি আস্ত একটা দ্বীপ কিনবেন। একটা কেন, চার-পাঁচটা দ্বীপ কেনাও তাঁর কাছে কোনো বিষয় না।

মনজু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। রহমতুল্লাহ বললেন, পাক কোরান মজিদে একটা আয়াত আছে, সেখানে আল্লাহপাক বলেছেন— 'আমি যাহাকে দেই তাহাকে কোনো হিসাব ছাড়াই দেই। আবার যাহাকে দেই না তাহাকে কিছুই দেই না। ইহা আমার ইচ্ছা।' নাপাক মুখে কোরান মজিদের আয়াত বলেছি, বিরাট গুনাহর কাজ করেছি। আল্লাহগো, বান্দাকে মাফ কর। মনজু, তোমার কাছে

সিগারেট আছে ? থাকলে একটা সিগারেট দাও। নেশার সময় সিগারেটটা ভালো লাগে।

মনজু সিগারেট দিল। রহমতুল্লাহ আয়েশ করে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন— আল্লাহপাক যে বলেছেন যাহাকে দেই না তাহাকে কিছুই দেই না— এটা অতি সত্যি কথা। তোমার আমার কথাই বিবেচনা কর। সত্যি না ?

মনজু বলল, জি সত্যি।

মাতালের জ্ঞানী জ্ঞানী কথা শুনতে ভালো লাগছে না। তারপরেও শুনতে হবে। মাতালরা অন্যের কথা শুনতে চায় না। নিজের কথা বলতে চায়। মনজু!

জি।

তোমার জন্যে একটা সংবাদ আছে। সংবাদটা ভালো না মন্দ বুঝতে পারছি না। অনেক মন্দ সংবাদও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় সংবাদটা আসলে মন্দ না, ভালো। আবার অনেক ভালো সংবাদ ঠিকমতো বিবেচনা...।

সংবাদটা কী বলেন।

রহমতুল্লাহ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন— ম্যাডাম তোমাকে আজ রাতেই চলে যেতে বলেছেন। খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর চলে যাও। তোমার কয়েক দিনের পাওনা বেতন আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। রাত এগারোটার সময় গেট বন্ধ হবে। গেট বন্ধ হবার আগে আগে চলে যাবে।

মনজু বিড়বিড় করে বলল, ভাইজানের সঙ্গে কি একবার দেখা করা যাবে ?

রহমতুল্লাহ সিগারেটের ছাই টোকা দিয়ে ফেলতে ফেলতে কঠিন গলায় বললেন, না।

রুনুদের বাসায় রাতের খাবার ন'টার আগেই শেষ হয়ে যায়। ইকবাল সাহেব রাত সাড়ে দশটায় একটা ঘুমের ট্যাবলেট খান। ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় যেতে নেই। ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার নিয়ম। এই ত্রিশ মিনিট তিনি মেয়ের সঙ্গে গল্প করেন। গল্প করতে খুব ভালো লাগে। মেয়েটা মাঝে মাঝে মাথা ঝাকায়, তখন বেণী করা চুল মুখের উপর এসে পড়ে। এই দৃশ্যও দেখতে ভালো লাগে।

আজও রুনুর সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। গল্প জমছে না। রুনু চোখ-মুখ শক্ত করে বসে আছে। প্রশ্ন করলে কাটা কাটা জবাব দিচ্ছে। ইকবাল সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, তোর শরীর খারাপ না-কি রে ?

রুনু বলল, না।

ইকবাল সাহেব বললেন, দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। চোখ লাল। দেখি কাছে আয়, কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা দেখি।

রুনু বলল, জ্বর দেখতে হবে না। আমার জ্বর আসে নি। শরীর ঠিক আছে।

তাহলে কি মন খারাপ ?

মনও ঠিক আছে। আমার তোমাদের মতো হুটহাট করে মন খারাপ হয় না।

তোদের বেড়ানো কেমন হলো শুনি। মনজুর বসের ছেলে না-কি নিজেই আমাদের বাসায় এসেছিলেন ? তোর মা'র কাছে শুনলাম ছেলে অসম্ভব ভদ্র, অসম্ভব বিনয়ী। আবার না-কি খুবই সুন্দর ?

রুনু বলল, বাবা, উনি ভদ্র হলেও আমাদের কিছু যায় আসে না। অভদ্র হলেও আমাদের কিছু যায় আসে না।

ইকবাল সাহেব চিন্তিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে এরকম করছে কেন বুঝতে পারছেন না। তিনি আলাপ চালিয়ে যাবার জন্যে বললেন, তোরা সারাদিন কী করলি ?

রুনু বলল, নৌকায় করে বুড়িগঙ্গায় ঘুরলাম। যেখানে নৌকাডুবি হয়ে ঘসেটি বেগম মারা গিয়েছিলেন, উনি সেই জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। খুঁজে পাওয়া গেল না।

ইকবাল সাহেব বললেন, ঘসেটি বেগমটা কে ?

নবাব সিরাজদ্দৌলার খালা। বাবা শোন, আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমার আধাঘণ্টা নিশ্চয় পার হয়েছে। ঘুমুতে যাও।

তুই কী করবি ?

আমি পড়াশোনা করব। আজ সারারাত পড়ব। দিনে বেড়াতে গিয়ে যে সময়টা নষ্ট করেছি, সেটা কাভার করব।

ইকবাল সাহেব বললেন, আমার মনে হয় রাতে সময়মতো ঘুমুতে গিয়ে খুব ভোরে উঠে পড়াশোনা করা ভালো। রাতের ঘুমের পর ব্রেইন রেস্টে থাকে। সকালবেলার পড়াটা মনে থাকে। আমি সারাজীবন এইভাবে পড়েছি।

রুনু বিরক্ত গলায় বলল, তুমি সারাজীবন এইভাবে পড়ে তেমন কিছু করতে পার নি বাবা। মেট্রিকে সেকেন্ড ডিভিশন, ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড ডিভিশন, বিএ'তে থার্ড ক্লাস। আর আমাকে দেখ— আমি আমার মতো পড়াশোনা করে মেট্রিকে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে থার্ড হয়েছি। ইন্টারমিডিয়েটে আরো ভালো করব।

ইকবাল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, অহঙ্কার করা ঠিক না মা। আল্লাহপাক যে অহঙ্কার করে তাকে পছন্দ করেন না। এই বিষয়ে রসুলুল্লাহর একটা হাদিস আছে। নবী-এ-করিম বলেছেন...

রুনু বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার এখন হাদিস শুনতে ইচ্ছা করছে না। আর আমি অহঙ্কার করেও কিছু বলি নি। তোমার কথাবার্তা শুনে রাগ করে বলেছি।

রাগ করার মতো কী বললাম ?

বাবা তুমি ঘুমুতে যাও। প্লিজ। আমি এখন পড়াশোনা শুরু করব।

ইকবাল সাহেব মন খারাপ করে উঠে পড়লেন। মেয়ের সঙ্গে ত্রিশ মিনিট সময় তার খুব ভালো কাটে। আজ রুনুর কী হয়েছে কে জানে! একবার মাথা পর্যন্ত ঝাকায় নি।

শায়লা ফ্লাক্স ভর্তি চা এনে মেয়ের টেবিলে রাখলেন। আইসক্রিমের খালি প্লাস্টিকের বাক্সে কয়েকটা পাতলা রুটি। রুনুর স্বভাব হচ্ছে, রাত জেগে বই হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়বে। মাঝে মাঝে চা'য়ে ভিজিয়ে রুটি খাবে। রাত জেগে পড়লে তার খুব ক্ষিধে পায়।

শায়লা রুনুর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তোর না-কি মেজাজ ভালো না ? তোর বাবা বলছিলেন।

রুনু বলল, মেজাজ ঠিক আছে।

শায়লা বললেন, নৌকাভ্রমণে আজ তোরা কী কী করলি শুনি।

রুনু বলল, কয়েকবার তো শুনেছ।

শায়লা বললেন, আমি কই শুনলাম ?

রুনু বলল, কী শুনতে চাও জিজ্ঞেস করো, আমি এক এক করে বলছি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া কোথায় করলি ?

মনজু ভাই প্যাকেটে করে খাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন।

কী খাওয়া ?

জানি না কী খাওয়া। মনে নেই।

শায়লা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে বসে আছে।

শায়লা বললেন, তুই রেগে আছিস কেন রে মা ?

রুনু হতাশ গলায় বলল, আমি কেন রেগে আছি নিজেও জানি না।

শায়লা বললেন, তোর তো অনেক বুদ্ধি। তুই না জানলে কে জানবে ?

রুনু বলল, আমার রাগ উঠেছে মনজু ভাইয়ের উপর।

শায়লা বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কী করেছে ?

রুনু বলল, তার বসের ছেলের দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণ তেলতেলা হাসি দিয়েছে। চাকরটাইপ হাসি। চাকরি নিয়ে সে বড় বড় কথা বলে, আমার ধারণা তার আসল চাকরি হলো, সে বসের ছেলের অ্যাসিসটেন্ট। জুতা ব্রাশ করে দেয়। ব্যাগে করে তার জন্যে পানির বোতল নিয়ে পেছনে পেছনে হাঁটে। রোদে বের হলে মাথায় ছাতা ধরে।

শায়লা বললেন, চুপ কর তো!

রুনু বলল, আচ্ছা যাও, চুপ করলাম। মা শোন, মনজু ভাইয়ের সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দেবার পাঁয়তারা করছ— এটা দয়া করে করবে না। আমি চাকর শ্রেণীর কাউকে বিয়ে করব না। বিয়ে যে করতেই হবে এমন তো কথা না। আমি ঠিক করেছি বিয়েই করব না।

শায়লা খানিকটা ভীত গলায় বললেন, রুনু, তোর শুভ্র নামের ছেলেটাকে খুব মনে ধরেছে। তাই না ?

রুনু মা'র দিকে কঠিন চোখে তাকাল। হয়তো কঠিন কোনো কথাও বলত, তার আগেই দরজার কলিংবেলের শব্দ হলো। রুনু সহজ গলায় বলল, আমার ধারণা মনজু ভাই এসেছে। আমি উঠতে পারব না। মা, তুমি দরজা খুলে দাও।

মনজুই এসেছে। তার গায়ে নতুন কেনা হালকা সবুজ রঙের হাফশার্ট। পায়ে নতুন জুতা। সঙ্গে স্যুটকেস। তার মুখ হাসি হাসি। রুনু বলল, আপনি কোত্থেকে ?

মনজু আনন্দিত ভঙ্গিতে বলল, আছে ঘটনা আছে। বিস্তারিত বলব। তার আগে চা খেতে হবে। কড়া চা। ডাবল পাত্তি। হেভি সুগার।

শায়লা খুশি মনে চা বানাতে গেলেন। মনজুকে দেখে হঠাৎ তার মন ভালো হয়ে গেছে। বুড়িগঙ্গায় কী কী ঘটনা ঘটেছে এখন বিস্তারিত শোনা যাবে। মনজু রুনুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আছ কেমন ?

রুনু বলল, আমি ভালোই আছি। আপনি মনে হয় ভালো নেই। সারাক্ষণ নকল হাসি হাসছেন।

মনজু বলল, নকল হাসি হাসব কেন ? দুঃখের হাসি হাসছি। বড় সাহেব বঙ্গোপসাগরে একটা দ্বীপ কিনেছেন। আমার পোস্টিং হয়েছে সেখানে। দ্বীপে বাড়িঘর করা, গাছ লাগানো— সব ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কাউকে পুরো

দায়িত্ব দিতে স্যার ভরসা পাচ্ছেন না। যেতে হচ্ছে আমাকেই। সমুদ্র পার হতে হবে, ভয়ে কলিজা পানি হয়ে যাচ্ছে। ভয়ের চোটে আসল হাসি নকল হয়ে গেছে।

রুনু বলল, পুরো দায়িত্ব আপনার একার ?

আরে না, আমার সঙ্গে ষোলজন স্টাফ। আমরা প্রথম দল। পরে আরো লোকজন যাবে। তুমি এইভাবে কেন হাসছ ? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ?

রুনু সহজ গলায় বলল, না।

মনজু আহত গলায় বলল, তোমার ধারণা আমি যা বলছি সবই ভুয়া ?

রুনু বলল, হ্যাঁ। আমার ধারণা আপনার চাকরি নট হয়ে গেছে। ওরা আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আপনার কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে আপনি আমাদের এখানে বিছানা বালিশ নিয়ে উঠেছেন।

মনজু বলল, তুমি আমার একটা সত্যি কথাও বিশ্বাস কর না— এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছি। আজ রাত একটার সময় আমাদের লঞ্চ ছাড়বে ভোলার দিকে। সকাল দশটায় লঞ্চ ভোলায় পৌছবে। সেখান থেকে সমুদ্রের অবস্থা বিবেচনা করে আমরা রওনা হবো মনপুরার দিকে।

রুনু বলল, আজ রাতেই রওনা হবেন ?

মনজু বলল, অবশ্যই। আমার পুরো স্টাফ চলে গেছে। আমি চা-টা খেয়েই রওনা দেব।

চা শেষ করে মনজু সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। রুনু বলল, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে যাবার দরকার কী! সকালে যান। রাতটা থেকে যান।

মনজুকে দেখে মনে হচ্ছে কথাটা তার মনে ধরেছে। সে তাকাল শায়লার দিকে। শায়লা বললেন, থেকে যাও না। মনজু তাকাল রুনুর দিকে। রুনুর মুখে চাপা হাসি। মনজু বলল, লঞ্চ একটার সময় ছাড়বে। সব দায়িত্ব আমার উপর। আমি থাকি কীভাবে ? ঝড় হোক বৃষ্টি হোক আমাকে যেতেই হবে। রুনু শোন, দ্বীপের ভেতর পড়ে থাকব, এক দুই বৎসর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। দ্বীপে তো পোস্টাপিস নেই যে চিঠিপত্র লিখব। ভালো থেকো। তবে দ্বীপে থাকতে যদি অসহ্য লাগে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসতে পারি।

বাইরে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় পানি জমে গেছে। মনজু পানিতে ছপছপ শব্দ করে এগুচ্ছে। তার স্যুটকেসটা হালকা। স্যুটকেসে তেমন কিছুই নেই। সেই হালকা স্যুটকেসটা এখন হাতে খুব ভারী লাগছে। ইচ্ছা করছে স্যুটকেসটা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতে। ঝাড়া হাত-পা হলে হাঁটতে সুবিধা।

চল্লিশ মিনিটের মাথায় মনজু কাকভেজা হয়ে ফিরে এসে জানাল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে লঞ্চ আজ রাতে ছাড়বে না বলে সে চলে এসেছে। রুনু খিলখিল করে হাসছে। শায়লা বিরক্ত গলায় বললেন, তুই এরকম হাসছিস কেন ? এই আবহাওয়ায় লঞ্চ ছাড়বে কেন ? হাসি থামা। রুনু হেসেই যাচ্ছে। চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারছে না।

রাত প্রায় বারোটা। কিছুক্ষণ আগেই মোতাহার হোসেন ফিরেছেন। তার মন অস্বাভাবিক ভালো। জাপানি কোম্পানি টাকাশিবো'র সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি একটা কন্ট্রাক্টে তিনি সাইন করেছেন। টাকাশিবো'র তিনজন ডিরেক্টরের একজন এই উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলেন। মোতাহার হোসেন তাকে আজকের শুভদিন মনে রাখার জন্যে কিছু উপহার দিয়েছেন। মি. সামা ওহারার উপহার খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছেন, তিনি তার জীবনে এত সুন্দর উপহার পান নি। তিনি চিন্তিত এত সুন্দর উপহার দেশে কীভাবে নিয়ে যাবেন। এয়ারপোর্টেই আটকে দেবে।

মোতাহার হোসেন হাসতে হাসতে বলেছেন, উপহার দেশে নিয়ে যাবার ব্যাপারে আপনার চিন্তা করতে হবে না। যে উপহার দিয়েছে তারই দায়িত্ব উপহার পৌছে দেয়া। জাপানি ভদ্রলোক আনন্দে অভিভূত হয়ে দু'বার কুর্নিশের মতো মাথা নিচু করলেন। জাপানিরা জাতি হিসেবেই ভদ্র।

উপহার দু'টির একটি হলো কষ্টিপাথরের শিবমূর্তি। আরেকটি হচ্ছে, মাথাসহ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া।

মোতাহার হোসেন রাত জাগেন না। আজ তার মনটা ভালো। জাপানের এই ডিলটা হবার কথা ছিল না। সরকারের এক মন্ত্রী পুরোটাই গুছিয়ে ফেলেছিলেন। শেষের দিকে এসে সেই মন্ত্রী মোতাহার হোসেনের প্যাঁচে ধরাশায়ী হয়েছেন। এমনই ধরাশায়ী যে তার মন্ত্রিত্ব থাকে কি-না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। দেশের তিনটি প্রধান সংবাদপত্রে মন্ত্রীর দুর্নীতিবিষয়ক এমন কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে— যা পাশ কাটানো সম্ভব না। সেই মন্ত্রী আজ সন্ধ্যাবেলায় মোতাহার হোসেনের কাছে লোক পাঠিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করতে চান। যত রাতই হোক, তার কোনো সমস্যা নেই। মোতাহার হোসেন যেখানে বলবেন, তিনি সেখানেই দেখা করবেন।

মোতাহার হোসেন জানিয়েছেন, তার শরীর খুবই খারাপ। ডাক্তারের নির্দেশে তিনি বিছানাতেই বন্দি। একটু সুস্থ হলে তিনি নিজেই দেখা করবেন।

শুভ্র'র ঘরে বাতি জ্বলছিল। মোতাহার হোসেন ধোঁয়াঘর থেকে সিগারেট শেষ করে ছেলের ঘরে উঁকি দিলেন। ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে।

শুভ্র বিছানায় পদ্মাসন হয়ে বসে আছে। তার চোখ বন্ধ। মোতাহার হোসেন আনন্দিত গলায় বললেন, Hello young man.

শুভ্র চোখ মেলতে মেলতে বলল, Hello old man and the sea.

মোতাহার হোসেন বললেন, ধ্যান করছিস না-কি ?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ। আজ আষাঢ়ি পূর্ণিমা তো...

আষাঢ়ি পূর্ণিমায় ধ্যান করতে হয় না-কি ?

এই দিন গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছিলেন, কাজেই ভাবলাম তাঁর স্টাইলে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকি। উনি বোধিবৃক্ষের নিচে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসতেন। আমি কম্পিউটারের নিচে পদ্মাসনে বসেছি।

মোতাহার হোসেন ছেলের পাশে বসতে বসতে বললেন, গৌতম বুদ্ধ ঝড়-বৃষ্টির রাতে ঘর ছাড়লেন ?

শুভ্র বলল, উনি ফকফকা জোছনায় ঘর ছেড়েছিলেন। সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশে। এই দেশে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতে বৃষ্টি হবেই। বাবা, কফি খাবে ? কফি বানিয়ে দেই ?

দে।

কীভাবে কফি বানাব একটু দেখ বাবা। চোখ বন্ধ করে কফি বানাব। যাতে অন্ধ হয়ে যাবার পর আমার আর কোনো সমস্যা না হয়।

মোতাহার হোসেন কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখ বন্ধ। সে খুব স্বাভাবিকভাবেই কফি বানাচ্ছে। শুভ্র বলল, বাবা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে— তুমি খুব আনন্দিত। কোনো কারণ আছে ?

মোতাহার হোসেন বললেন, কারণ আছে। বুদ্ধির খেলায় একজনকে হারিয়ে দিয়েছি। বুদ্ধিমান কাউকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারলে সবার আনন্দ হয়। আমার একটু বেশি হয়।

শুভ্র বলল, বুদ্ধির খেলায় আমাকে হারাতে পারবে ?

মোতাহার হোসেন কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

শুভ্র বলল, তোমার সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি হেরে গিয়ে মনে কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে আমার ভালো লাগে না।

মোতাহার হোসেন বললেন, তুই এত নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছিস যে আমি হেরে যাব ?

শুভ্র বাবার গায়ে হাত রেখে শান্ত গলায় বলল, বাবা, আমার অনেক বুদ্ধি।

অনেক বুদ্ধি ?

হ্যাঁ। বাবা, তুমি শুধু শুধু কফি খেয়ে আরাম পাচ্ছ না। এক কাজ কর সিগারেট ধরাও। সিগারেটের সঙ্গে কফি খাও।

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর মা যদি দেখে তোর ঘরে বসে সিগারেট খেয়ে ঘর গান্ধা করে ফেলেছি, তাহলে খুব রাগ করবে।

শুভ্র বলল, মা দেখতে আসবে না। তাঁর মাথা ধরেছে। মা দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছে।

মোতাহার হোসেন সিগারেট ধরালেন। তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে হঠাৎ সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। অথচ চিন্তিত হবার মতো কিছু ঘটে নি।

জাহানারার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। এতক্ষণ এসি চলছিল। এসি'র শব্দে তার মাথার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যাচ্ছে দেখে এসি বন্ধ করা হয়েছে। ঘর অন্ধকার। বাথরুমে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই আলো খানিকটা ঘরে আসছে। জাহানারা কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন। তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। ঘুম আসছে না। জাহানারার মাথার কাছে সকিনা বসে আছে। সকিনার সামনে বড় একটা বাটিতে বরফ মেশানো পানি। সকিনা নিজের হাত সেই পানিতে ডুবিয়ে হাত ঠাণ্ডা করছে। সেই ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জাহানারার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। জাহানারা পাশ ফিরলেন। বাথরুম থেকে আসা আলো তাকে কষ্ট দিচ্ছে। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করলে হয়তো একটু আরাম লাগত। কিন্তু তিনি অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না। ঘর অন্ধকার করলেই তার কাছে মনে হয় তিনি কবরে চলে গেছেন।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র কি এখনো তার বাবার সঙ্গে গল্প করছে ?

জি মা।

থাপ্পড় খাবে। তুমি তো আমার ঘরে বসে আছ। এখান থেকে বুঝলে কীভাবে ? তুমি কি পীর-ফকির হয়ে গেছ ? যাও দেখে এসে বলো।

সকিনা দেখে এসে বলল, এখন দু'জন গল্প করছে।

জাহানারা বললেন, কী নিয়ে গল্প করছে ?

সকিনা বলল, আমি শুনি নি মা। দেখেই চলে এসেছি। আড়াল থেকে শুনে আসব ?

জাহানারা বললেন, দরকার নেই। তুমি আরো বেশিক্ষণ হাত পানিতে ডুবিয়ে রাখবে। হাত ঠাণ্ডা হচ্ছে না। গরম হাতে মাথা হাতাচ্ছ কেন ?

সকিনা বলল, জি আচ্ছা মা।

জাহানারা বললেন, তুমি কি জানো আমার ছেলে আমাকে পছন্দ করে না ?

সকিনা বলল, এটা ঠিক না মা।

জাহানারা বললেন, মুখের উপর কথা বলবে না। আমি কী বলছি আগে শুনবে। হুটহাট কথা আমার পছন্দ না।

জি আচ্ছা।

আমার ছেলে যে আমাকে পছন্দ করে না— এটা আমার আজকের আবিষ্কার না। আমি টের পাই এক যুগ আগে। এক যুগ কী জানো ?

জানি।

বলো এক যুগ কী ?

বারো বছরে এক যুগ।

আমি বারো বছর আগে প্রথম টের পাই। শুভ্র'র কাছে একটা কাক আসত। কাকটা হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল। এতে শুভ্র'র মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন শুভ্র'র মন ভালো করার জন্যে তাকে একটা ময়না পাখি হালুয়াঘাট থেকে আনিয়ে দিলাম। ময়না পাখিটাকে আগেই কথা শেখানো হয়েছিল। সে বলত— এই শুভ্র! এই। সুন্দর একটা খাঁচায় করে পাখিটা তাকে দিলাম। শুভ্র সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা পাখিটা ছেড়ে দিল।

সকিনা নিচু গলায় বলল, পাখিটাকে খাঁচায় বন্দি দেখে ভাইজান মনে কষ্ট পেয়েছিলেন।

জাহানারা বললেন, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। পাখিটা আমি তাকে দিয়েছি বলেই সে ছেড়ে দিয়েছে। পাখিটা যদি তার বাবা দিত, তাহলে সে যত্ন করে রাখত।

সকিনা বলল, মা, কাঁদবেন না।

জাহানারা রাগী গলায় বললেন, আমি কাঁদছি তোমাকে কে বলল ফাজিল মেয়ে ?

জাহানারা শব্দ করেই কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, সকিনা, তুমি দেখে এসো, এখনো তারা গল্প করছে কি-না।

মোতাহার হোসেন এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিলেন। এখন চেয়ার ছেড়ে খাটে উঠে এসেছেন। পিতা-পুত্র দু'জনই খাটে। শুভ্র আগের মতোই পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসেছে। মোতাহার হোসেন খাটের মাথায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছেন। বাইরে ঝুমঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে তার বেশ ভালো লাগছে। মোতাহার হোসেন বললেন, তোর মা কাল তোকে নিয়ে কী একটা উৎসব না-কি করবে?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ কাল উৎসব। জন্মদিন পালন করা হবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, জন্মদিনে তোকে কী উপহার দেয়া হবে তুই কি জানিস?

শুভ্র বলল, জানি না, তবে অনুমান করতে পারি।

অনুমান কর।

আমি একবার মা'কে আমার স্বপ্নের কথা বলছিলাম। একা রবিনসন ক্রুশোর মতো একটা দ্বীপে থাকব। তখন লক্ষ করেছি মা'র চোখ চকচক করে উঠেছে। সেখান থেকে ধারণা করছি, মা হয়তো আমাকে একটা দ্বীপ দেবে। মনে হয় দ্বীপটা কেনা হয়েছে। যে কারণে তাড়াহুড়া করে মা জন্মদিনের উৎসব করছে। বাবা, দ্বীপ কি তুমি কিনেছ?

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর বুদ্ধি ভালো। শুধু বুদ্ধি বলা ঠিক হবে না। বুদ্ধি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা ভালো। অনেকের বুদ্ধি থাকে। সেই বুদ্ধি কাজে খাটিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না।

শুভ্র বলল, আমার তো তেমন কোনো কাজ নেই বাবা। আমি বেশিরভাগ সময় কাটাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অন্ধ হবার জন্যে অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করতে করতে নানান বিষয় নিয়ে ভাবি। গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হয়তো এইভাবেই ডেভেলপ করেছে। একটা বিশেষ ভাবনার কথা তোমাকে বলল?

বল।

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, মা যে আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে— এটা নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। কোনো মা তার সন্তানকে এত ভালোবাসবে না। কারণ সে জানে এই সন্তানটি তার। সে তারই অংশ। তাকে এত ভালোবাসার কিছু নেই। যখন

কোনো মা উন্মাদের মতো তার সন্তানকে ভালোবাসবে, তখন বুঝতে হবে এই সন্তানটি আসলে তার না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সন্তানটিকে নিজের করে নিতে। আমার কী মনে হয় জানো বাবা?

মোতাহার হোসেন বললেন, কী মনে হয়?

শুভ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমার মনে হয় প্রথম ছেলেটি জন্মের পরপর মারা যাওয়ায় মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরেরটির মৃত্যুর পর তাঁর অসুস্থতা প্রচণ্ড বেড়ে গেল, তখন তুমি কোনো জায়গা থেকে আমাকে যোগাড় করে মা'র কাছে দিয়েছিলে।

মোতাহার হোসেন শান্ত গলায় বললেন, তোর এরকম মনে হয়?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ। বাবা, আমি যা বলছি তা কি ঠিক?

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শুভ্র বলল, তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আমার কোনোরকম মিল নেই। চিন্তায় ভাবনায় কোনো কিছুতেই না। আমি জেনেটিকেলি তোমাদের চেয়ে আলাদা। কফি খাবে? আরেক কাপ কফি বানিয়ে দেই?

মোতাহার হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, না।

শুভ্র বলল, গল্প থাক। এখন এসো বুদ্ধির খেলা খেলি। বাবা, তুমি খেলবে?

মোতাহার হোসেন বললেন, না।

শুভ্র বলল, তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে।

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না, আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

শুভ্র বলল, বাবা, আমার কথা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে আমি খুব কষ্টে আছি?

মোতাহার হোসেন বললেন, মনে হচ্ছে না।

শুভ্র বলল, আমি কষ্টে নেই। নিজের ব্যাপারটা নিয়ে আমি যখন ভাবি তখন আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে।

ইন্টারেস্টিং কোন অর্থে?

শুভ্র বাবার কাছে এগিয়ে এলো। আগ্রহ নিয়ে বলল, প্রকৃতি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক চড়াই-উৎরাই পার করে মানুষ নামক ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমান একদল প্রাণী তৈরি করেছে। প্রকৃতি কেন এই কাজটা করেছে অতি বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু এখনো তা বের করতে পারে নি। মানবজাতি তার অস্তিত্বের কারণ না জেনেই এতদূর এসেছে, আরো অনেক দূর যাবে। তাকে ঘিরে থাকবে প্রচণ্ড

সংশয়। সে কে ? সে কোথা থেকে এসেছে ? সে কোথায় যাচ্ছে ? এই সংশয়ের তুলনায় আমার ব্যক্তিগত সংশয়টা কি খুবই তুচ্ছ না ?

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর মতো চিন্তা করলে হয়তো তুচ্ছ।

শুভ্র বলল, নিজের কথা ভেবে আমার মানসিকতায় কিছু পজেটিভ পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। আমি যখন সকিনাকে দেখি তখন তার উপর খুব মায়া লাগে। তাকে খুবই আপন লাগে। আমার মনে হয় সুলেমান চাচা যেমন অতি দরিদ্র কোনো ঘর থেকে সকিনাকে নিয়ে এসেছিলেন, আমাকেও নিশ্চয়ই সেরকম কোনো পরিবার থেকে এনেছেন। বাবা, মানুষের প্রতি আমার মমতা যে কী পরিমাণ বেড়েছে সেটা আমি জানি। আমি তোমাদের সত্যি ছেলে হলে এই মমতা তৈরি হতো না।

শুভ্র চুপ করল। মোতাহার হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, কথা শেষ, না আরো কিছু বলবি ?

শুভ্র বলল, আমার মধ্যে আরেকটা পরিবর্তন হয়েছে, সেটাও বলি— গৌতম বুদ্ধের মতো সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে গৃহত্যাগ করতে আমার যেমন একটুও খারাপ লাগবে না, আবার আস্ত একটা দ্বীপ নিয়ে বাস করতেও খারাপ লাগবে না। বাবা তুমি বলো, মানসিকতার এই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না ?

মোতাহার হোসেন ছেলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুভ্র'কে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, Do you want to know about your parents ?

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, না।

মোতাহার হোসেন বললেন, না কেন ?

শুভ্র বলল, তোমরা দু'জন যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছ সেটা তোমাদের ফেরত দিতে চাই। আমি যে তোমাকে কী পরিমাণে ভালোবাসি সেটা তুমি জানো ?

মোতাহার হোসেন বললেন, জানি।

শুভ্র বলল, মা জানে না। অবশ্যি এখানে আমার কিছু ত্রুটি আছে। মা'র প্রতি আমি এক ধরনের অবহেলা দেখাই। মা তখন দিশাহারা হয়ে যান। তাঁর দিশাহারা ভাব দেখতে ভালো লাগে। বাবা যাও, ঘুমুতে যাও।

মোতাহার হোসেন বললেন, তুই একটু কাছে আয় তো!

শুভ্র বলল, কেন ?

তোর হাত ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকব। কোনো সমস্যা আছে Young man?

শুভ্র বাবার হাত ধরতে ধরতে বলল, কোনো সমস্যা নেই Old man and the sea. বাবা, তুমি একটু হাস তো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তুমি মুখ ভোঁতা করে আছ।

মোতাহার হোসেন হাসলেন। শুভ্র বলল, তুমি এখন নিজের ঘরে ঘুমুতে যাবে। আমি যাব মা'র ঘরে। মা'র অভিমান ভাঙাব।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। দেখি তোর অভিমান ভাঙাবার টেকনিক।

শুভ্র বলল, তোমাকে নেয়া যাবে না। আমার টেকনিক, গোপন টেকনিক।

রাত দু'টার সময় জাহানারা বিছানায় উঠে বসলেন। সকিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও ঘুমুতে যাও।

সকিনা বলল, মা আমি থাকি, কোনো অসুবিধা নেই।

জাহানারা বললেন, তোমাকে যেতে বলছি তুমি যাও। সুবিধা অসুবিধা তোমাকে দেখতে হবে না।

সকিনা বলল, আপনার মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমেছে ?

জাহানারা বললেন, আমার মাথার যন্ত্রণা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে চলে যেতে বলেছি তুমি চলে যাও।

সকিনা ঘর থেকে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। জাহানারা বললেন, কে ?

শুভ্র বলল, মা আমি। ভেতরে আসি ?

জাহানারা বললেন, ভেতরে আসি আবার কী! আমার ঘরে ঢুকতে তোর অনুমতি লাগবে ?

শুভ্র বলল, বাতি জ্বালাই মা।

জাহানারা বললেন, জ্বালা।

শুভ্র বাতি জ্বালাল। মা'র সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, মা, আমি কি আজ রাতে তোমার ঘরে তোমার সঙ্গে ঘুমাতে পারি ?

জাহানারা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কী হয়েছে ?

কেন জানি হঠাৎ করে ভয় লাগছে। ভূতের ভয়। ঘরের বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো ঘরের ভেতর কে যেন হাঁটছে।

জাহানারা বললেন, আয় শো আমার পাশে। বলতে বলতে আনন্দে জাহানারার চোখে পানি এসে গেল। শুভ্র বলল, মা তোমার মাথাব্যথাটা কি গেছে ?

জাহানারা বললেন, আমার মাথাব্যথা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই শো। একটা বালিশে হবে ? না-কি আরেকটা বালিশ এনে দেব ?

শুভ্র বলল, মা তুমি শুয়ে থাক। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিচ্ছি।

জাহানারা বললেন, তোর এইসব পাগলামি আমার অসহ্য লাগে। তুই ছেলেমানুষ, তুই মাথায় হাত বুলাবি ?

দেখ না পারি কি-না। মা, শোও তো।

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন। শুভ্র মা'র কপালে হাত রাখতে রাখতে বলল, মা, তুমি মনজু ছেলেটাকে বিদায় করে দিয়েছ। এখন আমার দ্বীপ কে দেখবে ? আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম দ্বীপের দায়িত্ব মনজুকে দেব। চালাক ছেলে আছে।

জাহানারা বললেন, সুলেমানকে বলে কালকে নিয়ে আসিস।

শুভ্র বলল, কাঁদছ কেন মা ?

জাহানারা এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিলেন, এবার শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

শুভ্র বলল, মা, তুমি আমাকে এত ভালোবাস কেন ?

জাহানারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, তুই পাগলের মতো কথা বলিস কেন ? নিজের ছেলেকে আমি ভালোবাসব না ?

শুভ্র চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ তার কাছে মনে হলো রহস্যময় প্রকৃতি কেন হোমোসেপিয়ানস তৈরি করেছে তা সে যেন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে।

More Books
@
www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com